গণদাবী

সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়া (কমিউনিস্ট)-এর বাংলা মুখপত্র (সাপ্তাহিক)

৬৪ বর্ষ ৩৪ সংখ্যা | ২৭ এপ্রিল - ৩ মে, ২০১২ | প্রধান সম্পাদক ঃ রণজিৎ ধর | www.ganadabi.in | মূল্য ঃ ২ টাকা

২৪ এপ্রিল প্রতিষ্ঠা দিবসে শহিদ মিনারে বিশাল সমাবেশ

অগ্নি-৫ ঃ কার নিরাপত্তা, কীসের নিরাপত্তা

১৯ এপ্রিল অগ্নি-৫ এর সফল উৎক্ষেপণে প্রবল উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেছেন প্রধানমন্ত্রী এবং কংগ্রেস-বিজেপির নেতারা। আহ্লাদিত হয়েছে সিপিআই-সিপিএমও। আনন্দে মাতোয়ারা সংবাদ মাধ্যম লিখেছে—'চীন ও পাকিস্তান সহ সম্পূর্ণ এশিয়া এবং আফ্রিকা ও ইউরোপের একটা বড় অংশ এবার চলে এল ভারতের ক্ষেপণাস্ত্রের নাগালে। সূচনা হল এক নতুন অধ্যায়ের।' এই ক্ষেপণাস্ত্র পাঁচ হাজার কিলোমিটার পাল্লায় যে কোনও লক্ষ্যবস্তুকে নিখুঁতভাবে আঘাত হানতে সক্ষম। আমেরিকা, রাশিয়া, ব্রিটেন, চীন, ফ্রান্সের পর ভারতই এই অস্ত্রের অধিকারী হল।

কিন্তু দেশের সাধারণ মানুষ কি যোগ দিতে পারে এই উচ্ছ্বাসে? তাদের মনে বরং এই প্রশ্ন বারবার ধাক্কা দিচ্ছে যে, বিপুল ব্যয়ে এই ক্ষেপণাস্ত্র নির্মাণের দ্বারা দেশের কোটি কোটি সমস্যা-জর্জরিত সাধারণ মানুষের কী লাভ? রাষ্ট্রনেতারা দেশের নিরাপত্তা সুরক্ষিত করার যুক্তি তুলছেন। এতদিন এই অস্ত্র না থাকায় ভারত কার দ্বারা বিপন্ন হয়েছিল? ভারতের শাসক পুঁজিপতিশ্রেণি সব সময়ই তার প্রতিরক্ষা বরাদ্দ ক্রমাগত বাড়িয়ে চলার জন্য দেশের মানুষের সামনে কাল্পনিক শত্রু হিসাবে কোনও দেশকে খাড়া করে থাকে। এবারও তার ব্যতিক্রম হয়নি। তাদের পোঁ-ধরা সংবাদমাধ্যমগুলি এই প্রচারে জোর কদমে নেমে পড়েছে। কারণ, এইভাবে মনগড়া কোনও শত্রু খাড়া করতে না পারলে দেশের মানুষকে তার বিরুদ্ধে উত্তেজিত করে বছরে বছরে সামরিক বরাদ্দ ক্রমাগত বাড়িয়ে যাওয়া যায় না। সরকার স্পষ্ট করে বলুক, বাইরের কোন দেশের দ্বারা আক্রান্ত হওয়ার বিপদ তারা দেখছে। পাকিস্তান বা চীনের সঙ্গে কিছু সীমান্ত বিরোধকেই ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে যদি সামরিক আক্রমণের বিপদ বলে দেখানো হয়, তবে বিশ্বের অস্ত্র ব্যবসায়ী ও এ দেশের কাটমানি প্রাপকরা আহ্লাদিত হতে পারে, উগ্র জাতিদম্ভবাদীরা রসদ পেতে পারে, কিন্তু দেশের সচেতন মানুষ তাতে বিশ্বাস করবে না।

ভারত সরকারের নেতা-মন্ত্রী-আমলা-বিজ্ঞানীরা বলছেন, 'দেশের নিরাপত্তা ও প্রতিরক্ষা বন্দোবস্তকে আরও নিশ্ছিদ্র করতে এই আন্তর্মহাদেশীয় ক্ষেপণাস্ত্র সহায়ক হবে।' দেশ মানে কী? তা কি কোনও অখণ্ড সত্তা? না, তা নয়। এক দেশ ভারতের মধ্যেই দুটি ভারত আছে। একটি ভারত মুষ্টিমেয় ধনকুবের ও তাদের তল্পিবাহক মন্ত্রী-আমলা-রাজনীতিকদের। আর একটি হচ্ছে বিপুল সংখ্যক মধ্যবিত্ত, নিম্নবিত্ত ও গরিব শ্রমিক-কৃষক-সাধারণ মানুষের। একটি শাসক তথা শোষকদের, আর একটি শাসিত তথা শোষিতদের। সম্পূর্ণ পৃথক এই দুই সত্তার নিরাপত্তার ধারণাও দুই ধরনের। শাসক পুঁজিপতিশ্রেণির নিরাপত্তা মানে তাদের পুঁজি বিনিয়োগের নিরাপত্তা, লগ্নিপুঁজির নিরাপত্তা, সর্বাধিক মুনাফার নিশ্চয়তা। আর অপর সত্তা, দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ নব্বই ভাগ সাধারণ মানুষের কাছে নিরাপত্তা মানে তাদের জীবিকার নিরাপত্তা, মূল্যবৃদ্ধি-বেকারি-ছাঁটাইয়ের হাত থেকে নিরাপত্তা, বিনা চিকিৎসায় মৃত্যু থেকে নিরাপত্তা, অশিক্ষার হাত থেকে নিরাপত্তা, নারীর সম্ভ্রমের নিরাপত্তা, চাষির বাঁচার নিরাপত্তা। এই অস্ত্র কি সেই নিরাপত্তা তাদের দিতে পারবে? পারবে কি হাজার হাজার চাষিকে আত্মহত্যার হাত থেকে বাঁচাতে? প্রতিদিন যে অসংখ্য নারী লাঞ্ছনা নিপীড়ন ধর্ষণের শিকার হচ্ছে পারবে কি তাদের তা থেকে রক্ষা করতে? প্রতিদিন যে হাজার হাজার নারী পাচার হয়ে যাচ্ছে, এই অস্ত্র পারবে নারীদের তার হাত থেকে রক্ষা করতে? পারবে বেকার যুবকদের বেকারি দূর করতে? তা যদি না পারে তবে এই অস্ত্র নিয়ে এত গর্ব করার কী থাকতে পারে? অথচ এই একটি ব্যালিস্টিক মিসাইলের খরচেই দেশ থেকে সমস্ত প্রসূতি মায়ের অপুষ্টি দূর করা যেতে পারত, কলেরা-ম্যালেরিয়া-টিবি নির্মূল করা যেতে পারত, দেশ থেকে অশিক্ষা দূর করা যেতে পারত।

এই যে সহজ কথাগুলি, এগুলি সমস্ত নেতামন্ত্রীরা ভালোই জানেন। তা হলে?

যতই দেশের নিরাপত্তার কথা, দেশের মানুষের নিরাপত্তার কথা বলা হোক না কেন, আসলে এর পিছনে কাজ করছে ভারতীয় পুঁজির স্বার্থই। কল্পিত শত্রু ও বিপদের ধুয়া তুলে নিজেদের অস্ত্রসজ্জা বাড়িয়ে যাওয়ার যে পথ মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ অনুসরণ করে, পুঁজিবাদী ভারত রাষ্ট্র সে পথেই হাঁটতে চায়। দুনিয়ার সর্দার হয়ে অন্য দেশের উপর লাঠি ঘোরানোর সাম্রাজ্যবাদী নীতির পিছনে থাকে দেশে দেশে সাম্রাজ্যবাদী পুঁজির অবাধ প্রবেশের দ্বার খোলার মতলব। একের পর এক ক্ষেপণাস্ত্র, আধুনিক অস্ত্রের বিপুল আমদানি ইত্যাদি বুঝিয়ে দেয় ভারতীয় পুঁজিবাদী রাষ্ট্রটি এখন আর অতীতের মতো অস্ত্র প্রতিযোগিতার বিরুদ্ধে শান্তির বাণী দিতে রাজি নয়। একদিন ভারতীয় পুঁজির শক্তি অর্জনের তাগিদেই 'নিরস্ত্রীকরণ', 'নির্জোট আন্দোলন', 'শান্তি' ইত্যাদি বুলির আশ্রয় নেওয়ার প্রয়োজন ছিল। আজ ভারতীয় পুঁজি শক্তিশালী হয়ে মাল্টিন্যাশনাল হয়েছে, বিশ্বের বাজারে ঢুকেছে। এই উপমহাদেশে একাধিপত্যের সে দাবিদার। বৃহৎ শক্তির তকমার জন্যই তার প্রয়োজন নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্যপদ, প্রভাবশালী 'আইসিবিএম ক্লাব'-এর ষষ্ঠ সদস্যের স্বীকৃতি। এই আধিপত্যের অর্থ—এই অঞ্চলের যে কোনও দেশের অভ্যন্তরে সে ইচ্ছামতো হস্তক্ষেপ করতে পারবে। যে কোনও দেশের সঙ্গে বাণিজ্যিক লেনদেন তার নির্ধারিত শর্তেই সম্পাদিত হবে। কিন্তু মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীদের সহায়তা ছাড়া এ আকাঙ্খা পূরণ হওয়ার নয়। এই লক্ষ্য পূরণের উদ্দেশ্যেই ভারত এখন মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী জোটের শরিক, দক্ষিণপূর্ব এশিয়া, বিশেষত ভারত মহাসাগরীয় অঞ্চলে মার্কিন আধিপত্যের স্ট্র্যাটেজিক অংশীদার। আমেরিকাও ভারতকে বিশ্বস্ত পার্টনার মনে করে। তাই যে মার্কিন

সাতের পাতায় দেখুন

কার্টুন কাণ্ড ঃ প্রতিবাদে বুদ্ধিজীবী মঞ্চের সভা, মিছিল

অধ্যাপককে গ্রেপ্তারের প্রতিবাদে ১৭ এপ্রিল কলেজ স্কোয়ারে বুদ্ধিজীবী মঞ্চের পক্ষ থেকে ধিক্কার সভা এবং তরুণ স্যান্যালের নেতৃত্বে সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার পর্যন্ত মিছিল হয়।

কৃষক ডেপুটেশন, বিক্ষোভ, সভা

ফসলের ন্যায্য দামের দাবিতে ও সার সহ কৃষি উপকরণের দাম বৃদ্ধির প্রতিবাদে সারা ভারত কৃষি ও খেতমজুর সংগঠনের রাজ্য কমিটি ১২ এপ্রিল 'কৃষক বাঁচাও দিবসের' ডাক দেয়। এই কর্মসূচি অনুযায়ী মুর্শিদাবাদ, নদীয়া, কোচবিহার, পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, উঃ ২৪পরগণা, দঃ ২৪পরগণার নানা ব্লকে বিক্ষোভ-ডেপুটেশন-প্রতিবাদ সভা হয়।

সার সহ সমস্ত কৃষি উপকরণের অগ্নিমূল্য, অথচ ফসলের দাম নেই। বছরের পর বছর লোকসানে চাষ করতে করতে ঋণগ্রস্ত কৃষকরা দেশজুড়ে আত্মহত্যা করছে। কেন্দ্র ও রাজ্যের শাসন ক্ষমতায় থাকা সরকারগুলির কোনও হেলদোল নেই। এমতাবস্থায় মরার উপর খাঁড়ার ঘা-এর মতো এ'বছর বাজেটে সারে আরও সাত হাজার কোটি টাকা ভর্তুকি বিলোপ করা হয়েছে। তার ফলে সারের দাম আবার বাড়বে। এমনিতে গত বছর সারের দাম এক লাফে আড়াই-তিন গুণ বেড়েছে। এই পরিস্থিতিতে কৃষক পরিবারগুলির দুর্দশা আরও বাড়বে। বাড়বে কৃষকের আত্মঘাতী হওয়ার প্রবণতাও। দেশের সব বড় বড় দল ও তাদের কৃষক সংগঠন ক্ষমতায় টিকে থাকা বা ক্ষমতায় যাওয়ার জন্য ভোটের ময়দানে থাকলেও কৃষকদের পাশে কেউ নেই। একমাত্র এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট) দলের কৃষক সংগঠন সারা ভারত কৃষক ও খেতমজুর সংগঠন তাদের সর্বশক্তি নিয়ে কৃষকদের পাশে দাঁড়িয়ে লড়ছে। এ দিনের ডেপুটেশনে দাবি করা হয় —

(১) আত্মঘাতী কৃষক পরিবারকে পাঁচ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ দিতে হবে, (২) সারের ভর্তুকি বিলোপ করা চলবে না। সার ও কীটনাশকের মূল্য সরকারকে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে, (৩) সমস্ত কৃষি ঋণ মকুব করতে হবে, (৪) জবকার্ড হোল্ডারদের বছরে ২০০ দিন কাজ, ২০০ টাকা মজুরি ও নিম্ন-প্রান্তিক-গরিব কৃষকের জমিতে নিয়োগ করতে হবে।

স্পঞ্জ আয়রন কারখানার বিরুদ্ধে

স্পঞ্জ আয়রন কারখানার বিরুদ্ধে ১৬ এপ্রিল পশ্চিম মেদিনীপুরে প্রতিবাদ সভা। বক্তব্য রাখছেন অমল মাইতি।

সি পি ডি আর এস-এর কলকাতা জেলা সম্মেলন

প্রতিশ্রুতি মতো রাজনৈতিক বন্দিদের নিঃশর্ত মুক্তি, ইউ এ পি এ, আফস্পা সহ সমস্ত কালাকানুন বাতিল করা, যৌথবাহিনী প্রত্যাহার সহ বিভিন্ন দাবিতে ১৬ এপ্রিল কলকাতার ইস্ট লাইব্রেরি হলে 'কমিটি ফর প্রোটেকশন অফ ডেমোক্র্যাটিক রাইটস অ্যান্ড সেকুলারিজম (সি পি ডি আর এস)-এর কলকাতা জেলা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। আইনজীবী ভবেশ গাঙ্গুলি, অধ্যাপক গৌরীশংকর ঘটক প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন। মূল প্রস্তাব উত্থাপন করেন তমাল নন্দ। বক্তব্য রাখেন সি পি ডি আর এস-এর সভাপতি ডাঃ সুভাষ দাশগুপ্ত, রথীন গুঁই, তপন সিনহা, অসমঞ্জ ত্রিপাঠী, দিলীপ দাস, শংকর মুখার্জী, সুখনন্দন আহলিওয়ালা প্রমুখ। সভায় উপস্থিত ছিলেন সি পি ডি আর এস-এর সম্পাদক প্রণব দাশগুপ্ত। সভার কাজ পরিচালনা করেন সুশান্ত পাত্র। রথীন গুঁইকে সভাপতি ও তমাল নন্দকে সম্পাদক করে ১৭ জনের কমিটি গঠিত হয়েছে।

প্রবীণ পার্টি সদস্যের জীবনাবসান

এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট) দলের সদস্য এবং কৃষক ও খেতমজুর সংগঠনের পূর্ব মেদিনীপুর জেলা সভাপতি ও বিশিষ্ট সমাজসেবী কমরেড হরিপদ প্রামাণিক গত ২০ মার্চ ৮৬ বছর বয়সে নিজের বাসভবনে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তিনি কিশোর বয়সে স্বাধীনতা আন্দোলনে স্বেচ্ছাসেবক ছিলেন, পরবর্তীকালে বামপন্থার প্রতি আকর্ষণ থেকে সি পি আই দলের সাথে যুক্ত হন। গরিব মানুষের প্রতি তাঁর ভালোবাসা ছিল অগাধ। আন্দোলনের কারণে রেলের চাকরি খোয়ানোর ফলে তাঁকে চরম আর্থিক সংকটে পড়তে হয়। নিজের পারিবারিক সংকট ভ্রূক্ষেপ না করে তিনি মানুষের সমস্যায় সাহায্যের জন্য ছুটে যেতেন। তাঁর চরিত্রের এই মহৎ গুণের জন্য তিনি কোলাঘাটের মানুষের অত্যন্ত শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন।

৮ এপ্রিল এস ইউ সি আই (সি) দলের পূর্ব মেদিনীপুর জেলা কমিটির উদ্যোগে কোলাঘাট স্কুলে তাঁর স্মরণসভা অনুষ্ঠিত হয়, সভাপতিত্ব করেন কমরেড করুণ মুখার্জী। শ্রদ্ধা জানাতে উপস্থিত ছিলেন বিদ্যুৎ গ্রাহক সমিতির জেলা সভাপতি অধ্যাপক জয়মোহন পাল, কোলা ইউনিয়ন উচ্চবিদ্যালয়ের পরিচালন সমিতির সম্পাদক জগদীশ প্রসাদ গৌড়ী, কোলা ইউনিয়ন উচ্চবিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক সুজন বেরা, সিপিআই নেতা গুরুপদ ঘোড়ই, প্রাক্তন অধ্যক্ষ ডঃ তপন মণ্ডল, ডাঃ মলয় পাল, ডাঃ বিশ্বনাথ পড়িয়া, পেনসনার্স অ্যাসোসিয়েশনের অমলেন্দু বসু, কোলা সায়েন্স হবি সেন্টারের শ্যামল বসু, কোলাঘাট ব্যবসায়ী সমিতির বিষ্ণুপদ বিশই, বিশিষ্ট সমাজসেবী শচীনন্দন খাটুয়া প্রমুখ বিশিষ্ট নাগরিকবৃন্দ এবং সৌভ্রাত্র সংঘ, জয় জয় ক্লাব, কোলা সোস্যাল ওয়েলফেয়ার সোসাইটির প্রতিনিধিবৃন্দ। শ্রদ্ধা নিবেদন করেন এস ইউ সি আই (সি) রাজ্য সম্পাদক কমরেড সৌমেন বসু, রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড মানব বেরা, রাজ্য কমিটির সদস্য এবং কৃষক ও খেতমজুর সংগঠনের রাজ্য সম্পাদক কমরেড পঞ্চানন প্রধান, জেলা সম্পাদক কমরেড দিলীপ মাইতি সহ জেলার অন্যান্য নেতৃবৃন্দ। স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে এই সকল গুণের উল্লেখ করে আলোচনা করেন প্রয়াত হরিপদবাবুর গুণমুগ্ধ বিশিষ্ট নাগরিকবৃন্দ।

এস ইউ সি আই (সি) দলের পক্ষ থেকে কমরেড মানব বেরা বলেন, শেষ বয়সে তিনি সি পি আই দলের আন্দোলনবিমুখ রাজনীতি দেখে ১৯৯০ সালে প্রায় ষাটোর্ধ্ব বয়সে মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষের চিন্তাধারার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে এস ইউ সি আই (সি) দলের সাথে যুক্ত হন। তারপর থেকে দলের প্রতিটি আন্দোলনে তিনি তরুণদের মতোই সক্রিয় ভূমিকা নিতেন। বিদ্যুতের মূল্যবৃদ্ধির বিরুদ্ধে ও সারের মূল্যবৃদ্ধির বিরুদ্ধে আন্দোলন, নদীবাঁধ ভাঙন রোধ আন্দোলন সহ নানা আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন। নিজের পরিবারের প্রতি দায়িত্বের চেয়ে সমাজের অসহায় মানুষের প্রতি দায়বদ্ধতা তাঁর বেশি ছিল। তাঁর মৃত্যুতে দল একজন একনিষ্ঠ কর্মীকে হারাল।

কমরেড হরিপদ প্রামাণিক লাল সেলাম

ধরপাকড়ের প্রতিবাদে মোটরভ্যান চালকদের ডি সি (ট্রাফিক) দপ্তর অভিযান

সম্প্রতি উত্তর ২৪ পরগণা জেলার বিভিন্ন স্থানে ডি-সি (ট্রাফিক)-এর নির্দেশে মোটরভ্যান চালকদের উপর নেমে এসেছে প্রবল প্রশাসনিক হয়রানি, চলছে ব্যাপক হারে ধরপাকড়, অশ্রাব্য গালিগালাজ, জবরদস্তি, তোলাবাজি। গত ২ মার্চ খড়দহ, টিটাগড়, নোয়াপাড়ায় গাড়ি আটক করে কেস চাপিয়ে দেওয়ার প্রতিবাদে ৯ মার্চ পাঁচ শতাধিক মোটরভ্যান চালক বিক্ষোভ দেখান। বিক্ষোভ মিছিলের ডাক দিয়েছিল রাজ্যের একমাত্র রেজিস্টার্ড প্রতিবাদী সংগঠন সারা বাংলা মোটরভ্যান চালক ইউনিয়ন-এর ব্যারাকপুর মহকুমা কমিটি। প্রতিনিধি দলের সাথে আলোচনায় সংশ্লিষ্ট আধিকারিক আটক গাড়িগুলো ছেড়ে দেওয়ার ও ভবিষ্যতে প্রশাসনিক হয়রানি না করার প্রতিশ্রুতি দেন। তখনকার মতো গাড়িগুলি ছাড়া পেলেও ৯ এপ্রিল পুনরায় ধরপাকড় শুরু হয়, জগদ্দল থানায় আটক হয় আরও দু'টি মোটরভ্যান। শুরু হয় অশ্লীল হুমকি, গালিগালাজ। নোয়াপাড়া থানায় আটক করা হয় গাড়ি। চালকরা প্রবল উৎকণ্ঠার সাথে দিন কাটাচ্ছিলেন। এই অবস্থায় ১৮ এপ্রিল প্রচণ্ড তাপদাহের মধ্যেই ইউনিয়নের ডাকে শত শত ভ্যানচালক ডি সি (ট্রাফিক) দপ্তর অভিযান করেন। রাজ্য সম্পাদক কমরেড অশোক দাশের নেতৃত্বে ৪ জনের এক প্রতিনিধিদল সংশ্লিষ্ট আধিকারিকের সাথে আলোচনা করলে সুষ্ঠু সমাধানের আশ্বাস দেওয়া হয়।

রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র সম্মেলন

শিক্ষার বেসরকারিকরণ, ফি বৃদ্ধি, অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত পাশফেল তুলে দেওয়ার বিরুদ্ধে ১২ এপ্রিল এ আই ডি এস ও রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় ইউনিটের ছাত্র সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে বিশ্ববিদ্যালয়ের আভ্যন্তরীণ সমস্যা, যেমন অনিয়মিত ক্লাস, ল্যাবরেটরির সমস্যা ইত্যাদির সমাধানের দাবি জানানো হয়। দাবি ওঠে, সমস্ত বিভাগে বিএড, এম ফিল, পি এইচ ডি চালু করতে হবে। বক্তব্য রাখেন কমরেডস ইমতিয়াজ আলম, সুজিত পাত্র, নমিতা পাল প্রমুখ। কমরেড মেঘবরণ হাইতিকে সভাপতি ও কমরেড সেলিম মল্লিককে সম্পাদক করে ১৮ জনের কমিটি গঠিত হয়।

কমরেড শিবদাস ঘোষের শিক্ষা থেকে

প্রকৃত বিপ্লবী হিসাবে নিজেদের গড়ে তুলতে হলে মার্কসবাদকে জীবনদর্শন হিসাবে গ্রহণ করতে হবে

ভারতের মাটিতে যথার্থ সাম্যবাদী দল এস ইউ সি আই (সি)-এর প্রতিষ্ঠাতা সাধারণ সম্পাদক, এ যুগের বিশিষ্ট মার্কসবাদী চিন্তানায়ক কমরেড শিবদাস ঘোষের অমূল্য রচনা 'কেন ভারতবর্ষের মাটিতে এস ইউ সি আই (সি) একমাত্র সাম্যবাদী দল' বই থেকে একটি অংশ ২৪ এপ্রিল এস ইউ সি আই (সি) দলের ৬৪তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষে প্রকাশ করা হল।

...কমিউনিস্ট হওয়ার প্রক্রিয়ায় মধ্যবিত্ত শ্রেণিকে ছাড়তে হবে মধ্যবিত্তশ্রেণিসুলভ ভাবালুতা, পেটিবুর্জোয়া দোদুল্যমানতা, অভ্যাস, আচরণ ও সর্বোপরি ব্যক্তিকেন্দ্রিক চিন্তাপদ্ধতি। আর, শ্রমিককে ছাড়তে হবে শ্রমিকদের যেগুলো গ্রাম্য অভ্যাস অর্থাৎ পুরনো সামন্তী সমাজের কুসংস্কার এবং নানা ধরনের বুর্জোয়া অপসংস্কৃতি এবং নোংরা ব্যক্তিবাদের প্রভাব থেকে তাদের নিজেদের মুক্ত করতে হবে। আমাদের দেশের মতো একটি পিছিয়ে পড়া অথচ প্রতিক্রিয়াশীল পুঁজিবাদী দেশের শ্রমিকদের মধ্যে প্রচলিত সমাজব্যবস্থার তিন ধরনের প্রভাব দেখতে পাওয়া যায়। যতক্ষণ বিপ্লবী চেতনায় উদ্বুদ্ধ না হচ্ছে, ততক্ষণ তিনটে ভাগে তাকে ভাগ করা যায়। শ্রমিকরা যারা চাষি পরিবার থেকে এসেছে এবং চাষি সমাজের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করে চলেছে, তাদের মধ্যে রয়েছে গ্রামীণ সমাজের, সামন্তী সমাজের সংস্কার, একগুঁয়েমি এবং নানাধরনের গ্রাম্য অভ্যাস। শ্রমিক হওয়া সত্ত্বেও গ্রামীণ সামন্তী সমাজের সংস্কৃতির তারা শিকার। তার থেকে তাদের নিজেদের মুক্ত করতে হবে। আর একদল শ্রমিক যারা নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবার থেকে অর্থনৈতিক কারণে মজুরে পর্যবসিত হয়ে শ্রমিকদের মধ্যে এসেছে, তারা শ্রমিকে পরিণত হওয়া সত্ত্বেও বাবুসমাজের সাথে তাদের সংস্কৃতিগত, অভ্যাসগত, রুচিগত যোগাযোগ আজও চলে না যাওয়ার ফলে তারা মজুরদের মধ্যে নিয়ে আসছে মধ্যবিত্ত বাবুসমাজের ভাবালুতা, পেটিবুর্জোয়া দোদুল্যমানতা এবং ব্যক্তিনেতৃত্বের কোন্দল ও

শুধু রাজনৈতিক তত্ত্ব বিশ্লেষণের জন্য মার্কসবাদ — এভাবে মার্কসবাদকে গ্রহণ করলে বা দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের তিনটি সূত্র মুখস্থ করে ফেলতে পারলে, তার দ্বারাই কেবলমাত্র কেউই মার্কসবাদী-লেনিনবাদী হতে পারে না।

অর্থনীতিবাদ। আর একদল শ্রমিক, তাদের সংখ্যা যদিও কম, তারা এই দুটো ভাবধারা থেকেই একেবারে বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়ে শ্রেণী অবস্থানের দিক থেকে সর্বহারার সবচাইতে বিপ্লবী অংশে পর্যবসিত হয়েছে। শ্রমিকদের মধ্যে তারাই সবচাইতে বেশি বিপ্লবী — এই অর্থে যে, পুরনো সমাজের সাথে তাদের সমস্ত প্রকার সামাজিক সম্পর্কের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছে। কিন্তু তারাও বুর্জোয়া সমাজের মধ্যে যেটা সবচাইতে প্রতিক্রিয়াশীল সংস্কৃতি, অর্থাৎ নোংরা ব্যক্তিবাদ, বেপরোয়াভাব — যে বেপরোয়াভাব হচ্ছে উদ্দেশ্যহীন অর্থাৎ অন্ধ প্রকৃতির — তার সম্পূর্ণ শিকার। শিক্ষিত, তথাকথিত জ্ঞানালোকপ্রাপ্ত বুর্জোয়াদের মধ্যে শিক্ষার আবরণের জন্য যেটাকে আমরা অন্যরকমভাবে দেখি, শিক্ষা বাদ দিয়ে ঐ নোংরা ব্যক্তিবাদের প্রভাব এই সমস্ত শ্রমিকদের মধ্যে দেখতে পাওয়া যায়। ফলে শ্রমিকদের মধ্যে এই যে খুব অগ্রণী অংশ, যারা শ্রেণীগত অবস্থানের দিক থেকে সবচেয়ে বিপ্লবী, তাদেরও যদি ঐ বুর্জোয়া নোংরা ব্যক্তিবাদের মানসিকতা থেকে মুক্ত করে তাদের মধ্যে সমষ্টির প্রতি দায়-দায়িত্ব এবং সমষ্টিগত দায়িত্ববোধ সৃষ্টি করতে পারা না যায় এবং তাদেরও যদি কমিউনিস্ট চেতনার স্তরে উন্নীত করতে না পারা যায়, তা হলে তারাও কমিউনিস্ট হতে পারে না। সুতরাং, তাদেরও কমিউনিস্ট চরিত্র আয়ত্ত করতে হবে।

তা হলে এই আলোচনার মধ্য দিয়ে আপনারা সহজেই বুঝতে পারছেন যে, মার্কসবাদী এবং বিপ্লবী হিসাবে নিজেদের গড়ে তুলতে হলে প্রত্যেককেই ব্যক্তিগতভাবে ও সম্মিলিতভাবে সঠিক পদ্ধতিতে সচেতন সংগ্রামের মধ্য দিয়ে মার্কসবাদকে একটি সত্যিকারের জীবনদর্শন হিসাবে গ্রহণ করতে হবে যা জীবনের প্রতিটি দিককে প্রভাবিত করবে এবং পরিবর্তিত করবে। শুধু রাজনৈতিক তত্ত্ব বিশ্লেষণের জন্য মার্কসবাদ — এভাবে মার্কসবাদকে গ্রহণ করলে বা দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের তিনটি সূত্র মুখস্থ করে ফেলতে পারলে, তার দ্বারাই কেবলমাত্র কেউই মার্কসবাদী-লেনিনবাদী হতে পারে না। পার্টির কোনও না কোনও সংগঠনের সাথে যুক্ত থেকে জনগণের বিপ্লবী আন্দোলন গড়ে তোলার সংগ্রামের মধ্যে সক্রিয়ভাবে নিজেকে যুক্ত রেখে ব্যক্তিচিন্তা ও ব্যক্তিস্বার্থকে সর্বহারাশ্রেণীর বিপ্লবী চিন্তাভাবনা ও স্বার্থের সাথে অর্থাৎ বিপ্লবের স্বার্থের সাথে একাত্ম করে গড়ে তোলার নিরলস সংগ্রামের মধ্য দিয়ে উন্নত সংস্কৃতিগত মান অর্জন করার পথেই কেবলমাত্র একজন ব্যক্তি কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বকারী কর্মীতে পরিণত হতে পারে। এই সংগ্রামটিকে এড়িয়ে গিয়ে যে কেউ যত বড় ক্ষমতাবানই হোন না কেন, কারোরই কমিউনিস্ট হওয়ার উপায় নেই। এমনকী, মানবেন্দ্র নাথ রায়-এর মতো যে ক্ষমতাবান 'ইনটেলেকচুয়াল', তিনিও বাস্তবে এই সংগ্রামটি এড়িয়ে গিয়েই শেষপর্যন্ত কমিউনিস্ট হতে পারলেন না। অথচ, মানবেন্দ্র নাথ রায়ের পাণ্ডিত্য (intellectual ability) এত উঁচুস্তরে ছিল যে, সেই পাণ্ডিত্যের কাছে সুভাষ বোস, জহরলাল নেহেরু এবং এমনকী তদানীন্তনকালের অনেক সমাজতান্ত্রিক এবং মার্কসবাদী নেতারাই মাথা ঝুঁকিয়েছেন। তৎকালীন সময়ে ভারতবর্ষে এই একজন মাত্র মার্কসবাদী বলে পরিচিত নেতা, যিনি জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রায় সমস্ত শাখাতেই বিচরণ করেছিলেন। অথচ, এতবড় একটা ক্ষমতা নিয়ে লেনিনের সঙ্গে থেকে কমিউনিস্ট আন্দোলনে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত থাকা সত্ত্বেও তিনি শেষপর্যন্ত ঘোরতর কমিউনিস্ট বিদ্বেষীতে পরিণত হয়েছিলেন। 'ইনটেলেকচুয়াল অ্যাপটিচুড' এত উঁচুস্তরে থাকা এবং জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় তাঁর দখল — এসব কোনও কিছুই শেষপর্যন্ত তাঁকে রক্ষা করতে পারেনি। এর কারণ হচ্ছে, জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন তত্ত্বগুলোকে আয়ত্ত করার সাথে সাথে দ্বন্দ্বমূলক পদ্ধতিতে সেগুলোকে সংযোজিত (co-ordinate) করতে না পারার ফলে ব্যক্তিগত জীবনের প্রতিটি আচরণ, অভ্যাস ও রুচির প্রকাশ মার্কসবাদ-লেনিনবাদ এবং বিপ্লবী আন্দোলনের পরিপূরক কি না, সে দিকে লক্ষ রেখে শ্রমিকশ্রেণীর স্বার্থের সাথে একাত্ম করে নিজেদের গড়ে তোলার সংগ্রামটি তিনি পার্টির অভ্যন্তরে সঠিকভাবে পরিচালনা করতে পারেননি। ফলে, এতবড় ক্ষমতার অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও তিনি শেষপর্যন্ত একজন চূড়ান্ত প্রতিক্রিয়াশীল কমিউনিস্ট বিদ্বেষীতে পরিণত হয়েছিলেন।

আমাদের দেশের পূর্বের অবিভক্ত কমিউনিস্ট পার্টি এবং বর্তমানে তিন ভাগে বিভক্ত এই পার্টিটির ইতিহাস, এদের নেতা ও কর্মীদের কার্যকলাপ, আচার-আচরণ পর্যালোচনা করে দেখা গেল, এঁরা প্রত্যেকেই পার্টি গড়ে তোলার ক্ষেত্রে কমিউনিস্ট পার্টি গড়ে তোলার এই আসল সংগ্রামটি বাদ দিয়েই দল গঠনের চেষ্টা করেছেন। কর্মীদের সততা, নিষ্ঠা, আত্মত্যাগ, লড়াই সবকিছু সত্ত্বেও ব্যক্তিবাদের প্রভাব থেকে নিজেদের সম্পূর্ণ মুক্ত করার জন্য পার্টি ও বিপ্লবের সাথে জীবনকে একাত্ম করে গড়ে তোলার সংগ্রামটি পার্টির অভ্যন্তরে সচেতন ও যৌথভাবে পরিচালনা না করতে পারার ফলে এদের কোনওটিই একটি সঠিক বিপ্লবী দল হিসাবে কোনওদিন গড়ে ওঠেনি। ফলে মার্কসবাদকে আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করা সত্ত্বেও পার্টির অভ্যন্তরে কমিউনিস্ট চরিত্র গঠন এবং যারা পার্টি গঠন করার জন্য আত্মনিয়োগ করল তাদের মধ্যে (১) জীবনের সকল দিক ও প্রতিটি কার্যক্রমকে ব্যাপ্ত করে আদর্শগত কেন্দ্রিকতা, অর্থাৎ সম-চিন্তাপদ্ধতি, সম-চিন্তা, সম-বিচারধারা, সম-উদ্দেশ্যমুখীনতা; (২) যৌথ নেতৃত্বের বিশেষীকৃত ধারণা এবং (৩) একদল 'প্রফেশনাল' বিপ্লবী (জাত বিপ্লবী) গড়ে তোলার দীর্ঘ ও জটিল সংগ্রামটি এড়িয়ে যাওয়ার ফলে সি পি আই এবং সি পি আই(এম) উভয় দলই কতগুলো পেটিবুর্জোয়া রাজনৈতিক গোষ্ঠী ও ব্যক্তির সাধারণভাবে গৃহীত শুধুমাত্র রাজনৈতিক কর্মসূচির ভিত্তিতে একত্রে রাজনৈতিক সংগ্রাম পরিচালনার একটি প্ল্যাটফর্মে পরিণত হয়েছে এবং নকশালপন্থীরা পার্টি গঠন করলে সেই পার্টিরও এই একই পরিণতি হবে।

তা হলে নানাদিক থেকে আলোচনা করে দেখা গেল, পূর্বের অবিভক্ত এবং বর্তমানে তিন ভাগে বিভক্ত কমিউনিস্ট পার্টির কোনও অংশের দ্বারাই আর যে কাজই হোক না কেন, শোষিত মানুষের পুঁজিবাদবিরোধী মুক্তি সংগ্রামের মতো

তৎকালীন সময়ে ভারতবর্ষে এই একজন মাত্র মার্কসবাদী বলে পরিচিত নেতা (এম এন রায়), যিনি জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রায় সমস্ত শাখাতেই বিচরণ করেছিলেন। ... (কিন্তু) 'ইনটেলেকচুয়াল অ্যাপটিচুড' এত উঁচুস্তরে থাকা এবং জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় তাঁর দখল — এসব কোনও কিছুই শেষপর্যন্ত তাঁকে রক্ষা করতে পারেনি।

একটি জটিল সংগ্রামের নেতৃত্ব দেওয়া কোনওমতেই সম্ভব নয়। আর তত্ত্বগত ক্ষেত্রে এদের নানা ভুলভ্রান্তির কথা বাদ দিলেও যে জিনিসটা আজ কমিউনিস্ট আন্দোলনে সবচাইতে মারাত্মক হয়ে দেখা দিয়েছে, যা দেশের চূড়ান্ত ক্ষতিসাধন করে চলেছে, তা হচ্ছে, এই পার্টিগুলির নেতা ও কর্মীদের প্রাত্যহিক জীবনযাত্রা ও ব্যবহারের ক্ষেত্রে যে সুবিধাবাদ এবং আচার-আচরণ-উক্তিতে এদের যে নিম্ন সংস্কৃতিগত মান প্রতিফলিত হচ্ছে, যা আমি এতক্ষণ ধরে আপনাদের সামনে আলোচনা করলাম, সেইগুলি কমিউনিস্ট আদর্শের মতো এতবড় একটা বৈজ্ঞানিক ও মহান আদর্শের মর্যাদা জনসাধারণের চোখে ক্রমেই নামিয়ে দিচ্ছে। ফলে কমিউনিজমের আদর্শ এবং বিপ্লবী সংগ্রামের মহান প্রতীক লাল ঝান্ডার মর্যাদাকে রক্ষা করার জন্য এবং পুঁজিবাদবিরোধী সংগ্রামে নেতৃত্ব দেওয়ার জন্যই এ দেশে একটি সত্যিকারের কমিউনিস্ট পার্টি গঠন করা এবং তাকে শক্তিশালী করা দরকার । আর এইজন্যই দীর্ঘদিন ধরে অক্লান্ত সংগ্রামের মধ্য দিয়ে এস ইউ সি আই (সি) একটি সাম্যবাদী দলের সমস্ত বৈশিষ্ট্যগুলি নিয়েই এ দেশে গড়ে উঠেছে।

পুনরায় প্রকাশিত

নভেম্বর বিপ্লবের শিক্ষা ও ভারতবর্ষের বিপ্লবী আন্দোলন

শিবদাস ঘোষ

মূল্য - ৭ টাকা

ভারতীয় সেনাবাহিনীতে দুর্নীতি ফাঁস

সম্প্রতি ভারতের সেনাপ্রধান অভিযোগ তুলেছেন যে সামরিক বাহিনী আকণ্ঠ দুর্নীতিতে নিমজ্জিত। সরকারি মহল থেকে যথারীতি সব অভিযোগ অস্বীকার করা হল। কিন্তু ১৯ এপ্রিলের সংবাদে দেখা গেল, ভেকট্রা কোম্পানির ট্রাক কেনা সংক্রান্ত দুর্নীতির তদন্তে ঐ কোম্পানির এক কর্তার বাড়ি এবং অবসরপ্রাপ্ত ব্রিগেডিয়ার পি সি দাস ও নয়ডায় অবসরপ্রাপ্ত কর্নেল অনিল দত্তের বাড়িতে তল্লাশি চালিয়েছে গোয়েন্দারা।

ঘটনার শুরু সেনাধ্যক্ষ বি কে সিংহের একটি অভিযোগ থেকে। তাঁর অভিযোগ প্রাক্তন সেনা গোয়েন্দা প্রধান তেজেন্দ্র সিংহ ৬০০টি নিম্নমানের ট্রাক কেনার জন্য ২০১০ সালে নাকি তাঁকে ১৪ কোটি টাকা ঘুষ দিতে চেয়েছিলেন। ভেকট্রা গোষ্ঠীর এই টাট্রা ট্রাকগুলি রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা ভারত আর্থ মুভার্স লিমিটেড (বি ই এম এল)-এর মাধ্যমে প্রতিরক্ষা দপ্তর কেনে। ১৯৮৬ সালে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধীর আমলে এই চুক্তি হয়। তখন থেকে সেনাবাহিনীতে টাট্রা ট্রাক সরবরাহ হচ্ছে। একচেটিয়াভাবে এই ট্রাক সেনাবাহিনীতে সরবরাহ কেন হচ্ছে সে প্রশ্ন উঠলে ইংল্যান্ডভিত্তিক ভেকট্রা গোষ্ঠীর চেয়ারম্যান রবি ঋষি সাংবাদিক সম্মেলন করে জানিয়ে দেন, ওঁদের আর নাকি কেউ প্রতিদ্বন্দ্বী নেই। অথচ রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা বি ই এম এল-এর প্রধান ভি আর এস নটরাজন স্বীকার করে নিয়েছেন, কোনও দরপত্র করে বা প্রতিযোগিতার মাধ্যমে এই ট্রাক কেনা হয়নি বা হচ্ছে না। বি কে সিংহ অভিযোগ করেছেন যে, এতদিন পর্যন্ত যে ৭০০০ ট্রাক ভেকট্রা সরবরাহ করেছে তা অত্যন্ত নিম্নমানের। ২০০৮ সালে জবলপুরের সাংসদ রাকেশ সিং প্রতিরক্ষা মন্ত্রীকে অভিযোগ জানান যে, জবলপুরের প্রতিরক্ষা দপ্তরের নিজস্ব গাড়ি প্রস্তুতকারী সংস্থার কারখানা থেকে কেন ট্রাক কেনা হচ্ছে না। এর ফলে নাকি সরকারের ৩০০০ কোটি টাকার ক্ষতি হয়েছে। সেনাপ্রধানও জবলপুরের কারখানা থেকে ট্রাক কেনার কথা বলে বলেছেন যে, প্রতিটা টাট্রা ট্রাকের দাম যেখানে ৬৫ লক্ষ টাকা, সেখানে দেশীয় প্রযুক্তির ট্রাকের দাম পড়ে ৩০ লক্ষ টাকা। কিন্তু তা সত্ত্বেও দেশীয় ট্রাক কেনা হচ্ছে না কেন? বাঙ্গালোরে কংগ্রেসের শ্রমিক নেতা ডি হনুমনথাপ্পার অভিযোগ, টাট্রা ট্রাক কেনার ক্ষেত্রে অনিয়ম ও ঘুষ নেওয়ার কথা জানিয়ে ২০০৯ সালে প্রধানমন্ত্রী ও রাষ্ট্রপতিকে চিঠি দিয়েছিলেন তিনি। প্রতিরক্ষা মন্ত্রকেও এই চিঠির কপি যায়। কিন্তু তিন বছর হয়ে গেলেও কিছু হয়নি। বিজেপি বা কংগ্রেস যেই ক্ষমতায় থাকুক না কেন, প্রতিরক্ষা দপ্তর এবং রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থার এই ভূমিকা নিয়ে কেউ কোনও দিন প্রশ্ন তোলেনি। সম্প্রতি সেনাপ্রধানের অভিযোগের ভিত্তিতে সিবিআই যে তদন্ত শুরু করেছে, তাতে বলা হয়েছে যে, প্রাথমিকভাবে চেকোশ্লোভাকিয়ার বৈদেশিক বাণিজ্য সংস্থার সাথে সেনাযান নিয়ে চুক্তি হয়েছিল। কিন্তু জালিয়াতি করে ইউ কে ভিত্তিক ভেকট্রা গোষ্ঠী চুক্তিটি করায়ত্ত করে ১৯৯৭ সালে। অভিযোগ যে, এই চুক্তি সম্পাদিত হয়েছিল মাত্র তিনদিনে। সিবিআই বলছে যে, কোটি কোটি টাকা কাটমানির বিনিময়ে জিনিস কেনা হচ্ছে, সাথে সাথে ট্রাকগুলি খারাপ হয়ে গেলে সারানোর যে দায়িত্ব নেওয়ার কথা ছিল ভেকট্রা কোম্পানির, তারা সেটাও করেনি। এর ফলে রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা ভারত আর্থ মুভার্স সরকারের ১৩ কোটি ২৭ লক্ষ টাকার ক্ষতি করেছে বলে জানিয়েছে সিবিআই-এর এফ আই আর। ইতিমধ্যে সেনাবাহিনীর জমি, স্পেশাল ফ্রন্টিয়ার ফোর্সের নাইট ভিশন সরঞ্জাম, প্যারাশুট ইত্যাদি নানা সরঞ্জাম কেনায় আর্থিক দুর্নীতি হচ্ছে বলে এক তৃণমূল সমর্থক সাংসদ অভিযোগ তুলে সি বি আই তদন্তের দাবি করেছেন।

সেনাধ্যক্ষ মিডিয়াতে সাক্ষাৎকার দেওয়ার সময় নিজেই একথা স্বীকার করে নিয়েছেন যে, সেনাবাহিনীর রন্ধ্রে রন্ধ্রে দুর্নীতি ছড়িয়েছে, এই ক্যান্সার সারাতে বড় ধরনের অস্ত্রোপচার প্রয়োজন। পূর্বতন প্রধানমন্ত্রী দেবগৌড়ার পুত্র কুমারস্বামীও জানিয়েছেন, তাঁর বাবা যখন প্রধানমন্ত্রী ছিলেন, তখন তাঁকেই সামরিক অস্ত্রশস্ত্র কেনার জন্য একাধিকবার ঘুষ দিতে চাওয়া হয়েছিল। প্রতিরক্ষা মন্ত্রী জানিয়েছেন, দুর্নীতির জন্য গত ১০ বছরে ৬টি সংস্থাকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, ১০০ কোটি টাকার বেশি যে কোনও চুক্তিতেই বিশেষ কড়াকড়ি করা হবে। সেনাবাহিনীর অভ্যন্তরে দুর্নীতি নিয়ে অভিযোগ বহু পুরনো। ১৯৪৮ সালে দেশের প্রথম প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহেরুর আমলে ব্রিটিশ জিপ কেলেঙ্কারি, বোফর্স কামান কেনা নিয়ে প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধীর বিরুদ্ধে ঘুষ নেওয়ার অভিযোগ, বিজেপি সভাপতি বঙ্গারু লক্ষ্মণের বিরুদ্ধে প্রতিরক্ষা সরঞ্জাম কেনার জন্য ঘুষ নেওয়ার অভিযোগ, ২০০১ সালে ইজরায়েলের কাছ থেকে বারাক ক্ষেপণাস্ত্র কেনা নিয়ে দুর্নীতি, ২০০২-এ কার্গিল যুদ্ধে নিহত ভারতীয় সেনাদের জন্য কফিন কেনা নিয়ে দুর্নীতি, সুকনার জমি কেলেঙ্কারি, আদর্শ আবাসন কেলেঙ্কারি সহ গুচ্ছ গুচ্ছ দুর্নীতি বারবার প্রকাশ্যে এসেছে। এর কোনও শেষ নেই। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হল, এর কোনওটা নিয়েই তদন্ত শেষ করেনি সরকার তথা দেশের তদন্তকারী সংস্থাগুলি। কোনও অভিযোগেরই শেষ পর্যন্ত সমাধান হয়নি। অপরাধী কে তা দেশের মানুষের কাছে পরিষ্কার করার কোনও উদ্যোগ সরকার নেয়নি, বরং চেষ্টা করেছে কীভাবে নানা কূট বক্তব্য তুলে একে এড়িয়ে যাওয়া যায়। এবারেও অহেতুক কিছু নিয়মতান্ত্রিক বিতর্ক তুলে মূল প্রশ্নকেই সংসদে উপস্থিত সমস্ত বৃহৎ দল এবং সরকার এড়িয়ে গেছে। নাহলে এসব নিয়ে বেশি নাড়াচাড়া হলে তাদের আমলের নানা দুর্নীতি হয়তো প্রকাশ্যে চলে আসতে পারে। তাই বিজেপি নেতা অটলবিহারী বাজপেয়ী প্রধানমন্ত্রী থাকাকালীন জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা ব্রজেশ মিশ্র, যিনি বাজপেয়ীর অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ বলে পরিচিত, তিনি পর্যন্ত সেনাপ্রধানের বিরুদ্ধে ক্ষিপ্ত হয়ে কংগ্রেসের থেকেও সুর চড়িয়ে সেনাপ্রধানকে কেন বরখাস্ত করা হল না, তার কৈফিয়ৎ চেয়েছেন। বোঝাই যায়, মিশ্র মহাশয় ভয় পেয়েছেন পাছে কেঁচো খুড়তে কেউটে বেরিয়ে যায়।

সকল পুঁজিবাদী রাষ্ট্রের মতোই ভারতের পুঁজিবাদী রাষ্ট্রনায়করা দেশের মানুষকে বলেন যে, সেনাবাহিনী ও সরকার একটি পবিত্র প্রতিষ্ঠান — নিঃস্বার্থ 'দেশপ্রেমের প্রতীক'। দেশ সম্পর্কে মানুষের যে ভালোবাসা, তাকে কাজে লাগিয়ে দেশ এবং সেনাকে সমার্থক করে তুলে ধরে মানুষের মধ্যে সেনাবাহিনী সম্পর্কে মিথ্যা আবেগ সৃষ্টি করে বুর্জোয়া রাষ্ট্র সেনাবাহিনীর যাবতীয় হীন কার্যকলাপকেও গোপনীয়তায় ঢেকে রাখে। দেশরক্ষার আবেগকে কাজে লাগিয়ে প্রতি বছর বাজেটে প্রতিরক্ষা খাতে অর্থবরাদ্দ বাড়ানো হয়। কিন্তু জনগণ জানতে পারে না কোথায় কোন খাতে এত বিপুল অর্থ যাচ্ছে। ভারত সহ পৃথিবীর বেশিরভাগ দেশের শাসকদের কাছে অস্ত্র ব্যবসাই এখন সবচেয়ে লাভজনক ব্যবসা। এই সংকটগ্রস্ত পুঁজিবাদী দুনিয়ায় এক্ষেত্রেও বিভিন্ন অস্ত্র কোম্পানির মধ্যে তীব্র প্রতিযোগিতা চলছে। তাই মরিয়া পুঁজিপতিরা মুনাফা ধরে রাখতে যে কোনও রকম দুর্নীতির আশ্রয় নিতে প্রস্তুত। এ দেশের সরকারি নেতা, আমলা, মিলিটারি অফিসাররা এজেন্ট হিসাবে নিজ নিজ মালিক গোষ্ঠীর স্বার্থে কোনও কাজ করতে পিছপা নয়। এমনকী অবসরপ্রাপ্ত কিছু সেনা জেনারেলরা পর্যন্ত যুদ্ধাস্ত্রের ব্যবসায় হয় এজেন্টের কাজ করেন অথবা নিজেরা সরাসরি এই ব্যবসার অংশীদার। অতীতে এই ধরনের প্রাক্তন সেনা জেনারেলদের নাম জড়িয়ে গেছে ভারতীয় সেনাবাহিনীর সরঞ্জাম কেনাকাটার দুর্নীতিতে। এবারেও সেনাধ্যক্ষ বি কে সিংহ ঘুষ দেওয়ার জন্য যাঁকে দায়ী করেছেন তিনিও প্রাক্তন সেনা গোয়েন্দা প্রধান। বলা হচ্ছে, তিনি নাকি মিলিটারিতে যান সরবরাহকারী ভেকট্রা গোষ্ঠীর এজেন্ট।

সাথে সাথে এই ঘটনা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল, তথাকথিত দেশরক্ষায় নিবেদিত সেনাবাহিনী কত বড় দুর্নীতিগ্রস্ত প্রতিষ্ঠান। কেন এমন হল? দেশ রক্ষায় প্রাণ পর্যন্ত দিতে প্রস্তুত বলে, সেনাবাহিনীকে দেশপ্রেমের প্রতীক বলে উপস্থিত করা হয়, তা কেন চরম দুর্নীতিতে ভরে গেল? আসলে পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় মিলিটারির ভূমিকাকে 'দেশসেবা' বলে দেখানোর মধ্যেই রয়েছে চরম প্রতারণা। পুঁজিবাদী রাষ্ট্রের সকল আইন কানুন ও প্রতিষ্ঠানের মতোই এই মিলিটারির 'দেশসেবা' মানে পুঁজিপতি শ্রেণির সেবা করা, তাদের শোষণ-লুণ্ঠনের স্বার্থকে রক্ষা করা, রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস ও নিপীড়নের হাতিয়ার রূপে কাজ করা। এই কাজটাও একটা সবেতন চাকরি। যেখানে প্রয়োজনে রণাঙ্গণে প্রাণ দেওয়াও একটা আবশ্যিক শর্ত। ভারতের রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজ সবই যখন এই অবস্থায় পড়ে আছে, জালিয়াতি, প্রতারণা ও দুর্নীতির পাঁক যখন সর্বত্র, তখন এই পুঁজিবাদী ব্যবস্থার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ মিলিটারি দুর্নীতিমুক্ত হবে — এ ভাবাটাই শিশুসুলভ।

উত্তর দিনাজপুরে উদ্বোধন হল এস ইউ সি আই (সি) অফিস

২০০৯ সাল থেকে এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট) গোয়ালপোখর ব্লকের বিভিন্ন এলাকায় গণকমিটি তৈরি করে রেশন দুর্নীতির বিরুদ্ধে ও অন্যান্য দাবিতে বহু আন্দোলন গড়ে তুলেছে। বেশ কিছু আন্দোলন সফল হয়েছে। নীতি-নৈতিকতার ভিত্তিতে গড়ে ওঠা গণতান্ত্রিক আন্দোলনগুলির প্রতি আকৃষ্ট হয়ে কৃষক, শ্রমিক, ছাত্র, যুবক সহ নানা অংশের মানুষ দলের সঙ্গে যুক্ত হচ্ছেন। এই অবস্থায় গণআন্দোলনের কাজ এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য একটি পার্টি অফিসের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। ১৩ এপ্রিল এলাকার নেতা-কর্মীদের উপস্থিতিতে নতুন অফিসের উদ্বোধন হয়। রক্তপতাকা উত্তোলন করেন দলের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির সদস্য কমরেড শঙ্কর ঘোষ। তিনি বলেন, গরিব মানুষের মুক্তি আন্দোলন পরিচালনার কেন্দ্র হিসাবে এই অফিস পরিচালনা করতে হবে। এই কঠিন কাজ করতে হলে আপনাদের জ্ঞানচর্চা করতে হবে। বিপ্লবী রাজনীতি আত্মস্থ করতে হবে। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জেলা সম্পাদক কমরেড দুলাল রাজবংশী। তিনি ১৫ দফা দাবিতে ২ মাস ব্যাপী আন্দোলনের কর্মসূচি ঘোষণা করেন।

কলকাতায় কমসোমলের শিক্ষাশিবির

৬ এপ্রিল আর্য বিদ্যামন্দিরে অনুষ্ঠিত শিবির পরিচালনা করছেন কমরেড চণ্ডীদাস ভট্টাচার্য

২৪ এপ্রিল শহিদ মিনার ময়দানের বিশাল সমাবেশে বক্তব্য রাখছেন সাধারণ সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ। (বিস্তারিত আগামী সংখ্যায়)

১৪ মার্চের পার্লামেন্ট অভিযান ঃ আমেরিকার ওয়ার্কার্স ওয়ার্ল্ড পত্রিকার পাতায়

আমেরিকার ওয়ার্কার্স ওয়ার্ল্ড পার্টির মুখপত্রে গত ২ এপ্রিল সংখ্যায় পাশের ছবি সহ কমরেড হিদার কোটিন-এর নিচের প্রতিবেদনটি প্রকাশিত হয়েছে ঃ

''ভারতের রাজধানী দিল্লিতে গত ১৪ মার্চ কার্ল মার্কসের মৃত্যুদিবসে, এস ইউ সি আই (সি) পার্টির প্রায় এক লক্ষ সদস্য সমর্থক এক সুবিশাল মিছিলে সামিল হন। দেশের প্রায় সমস্ত নগর-শহর থেকে হাজার হাজার মানুষ এসেছিলেন এই মিছিলে অংশ নিতে। বেশ কয়েক মাস আগে থেকেই এস ইউ সি আই (সি) সদস্যরা ব্যাপক প্রচার ও দাবিপত্রে অসংখ্য মানুষের স্বাক্ষর সংগ্রহ অভিযান সংগঠিত করেন। ভারত সরকারের কাছে দেশের মানুষের দাবি তুলে ধরার জন্য তাঁরা প্রত্যন্ত গ্রাম থেকে শুরু করে প্রায় সমস্ত শহরে পৌঁছেছেন। দেশের প্রায় প্রতিটি মানুষের কাছে পৌঁছোবার লক্ষ্যে তাঁরা মাসাধিক কাল ধরে শত শত মাইল পথ অতিক্রম করেছেন।

বেকারি, খাদ্য ও পরিবহনের মূল্যবৃদ্ধি, শিশু ও নারী পাচার, বেসরকারিকরণ, দুর্নীতি, সরকার ও বহুজাতিক কর্তাদের অশুভ আঁতাত রোধ করার দাবি নিয়ে ৩ কোটি ৫৭ লক্ষ মানুষের স্বাক্ষরিত দাবিপত্র বহন করে তাঁরা দিল্লিতে এসেছিলেন। মিছিলে দাবি উঠেছে স্বাস্থ্য ও শিক্ষা ব্যবস্থার শোচনীয় হাল দূর করতে হবে।

মিছিলে অংশ নিতে আসা এই বিপুল সংখ্যক মানুষের রাতের আশ্রয়ের জন্য যে বিরাট বিরাট তাঁবুগুলি তৈরি হয়েছিল ঝড় বৃষ্টিতে সেগুলি ও রান্নার জায়গা, খাবার জলের আয়োজন সহ সমস্ত কিছু ধূলিসাৎ হয়ে যায়। কিন্তু আয়োজকরা জানালেন, এতদসত্ত্বেও 'অসুবিধা নিয়ে বিন্দুমাত্র গুঞ্জন শোনা যায়নি। সমবেত হাজার হাজার মানুষের আবেগ উৎসাহে এতটুকু ভাটা পড়েনি বা নেতা কর্মী-স্বেচ্ছাসেবকদের গভীর প্রত্যয় এতটুকু টোল খায়নি'। বরং এস ইউ সি আই (সি) সদস্যরা মনে করেছেন এই কঠিন পরীক্ষার মধ্য দিয়ে বিপ্লবী তেজ, চরিত্র আরও উদ্দীপ্ত হবে। এই বিশাল মিছিলে দিল্লির রাজপথ স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল, রাস্তার আশেপাশের শত শত মানুষ রাস্তায় নেমে এসে প্রতিবাদে অংশ নিয়েছেন। কিন্তু ভারতের কর্পোরেট সংবাদমাধ্যমে দিল্লির এই বৃহত্তম মিছিলের সংবাদ প্রায় ছিল না বললেই চলে।

আলুর দামবৃদ্ধি ঃ মজুতদার ও বৃহৎ ব্যবসায়ীদেরই খুশি করছে সরকার

আলুর দামবৃদ্ধি রোধের মোক্ষম দাওয়াই বাতলেছেন রাজ্যের কৃষি বিপণন মন্ত্রী অরূপ রায়। বলেছেন, দাম বাড়লেও চিন্তার কিছু নেই, যথেষ্ট আলু মজুত আছে রাজ্যের হিমঘরে। মানুষের তা হলে আর চিন্তা কী?

কিন্তু সমস্যা হয়েছে অন্যত্র। রাজ্যের হিমঘরে যথেষ্ট আলু মজুত থাকলে মূল্যবৃদ্ধিতে জেরবার আম-জনতার কী সুবিধা— সেটাই মাথায় ঢুকছে না রামা কৈবর্ত বা রহিম সেখদের। অথচ তারাই জনসংখ্যার শতকরা ৯০ ভাগ। তাদের মাথায় ঘুরছে শুধু একটাই চিন্তা — সংসার চালাবে কেমন করে! নিত্যপণ্যের দাম ঊর্ধ্বপানে ছুটছে রকেটের গতিতে। আলুসেদ্ধ-ভাত খেয়ে কোনওক্রমে যে কাটিয়ে দেবে — সে রাস্তাও বন্ধ হওয়ার পথে। খোলাবাজারে জ্যোতি আলুর দাম এপ্রিলের তৃতীয় সপ্তাহে ১৪-১৬ টাকা। কিন্তু তাতে নাকি চিন্তা করার কিছু নেই — জানিয়ে দিয়েছেন রাজ্যের কৃষি বিপণন মন্ত্রী। দাম নাকি সরকারের নিয়ন্ত্রণের বাইরে যায়নি। তাহলে কি সরকারের নিয়ন্ত্রণেই আলুর দাম বৃদ্ধি করা হচ্ছে? মন্ত্রী সেটা স্পষ্ট করে বলুন। বলুন, আলুর দাম বেড়ে কত টাকায় পৌঁছোলে তবে তা সরকারের নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাবে বলে তাঁরা মনে করেন? সিপিএম সরকারের আমলে একবার আলুর দাম খোলা বাজারে ২২ টাকা হয়েছিল। মাননীয় মন্ত্রী কি সেটাকেই পাখির চোখ করে রেখেছেন?

চাষি ৯ টাকা কেজি দাম পাচ্ছে বলে মন্ত্রী সংবাদমাধ্যমে জানালেও রাজ্যের বেশিরভাগ চাষি সর্বোচ্চ দর পেয়েছেন বড়জোর ৫ টাকা কেজি।

চাষি যা পেয়েছে আর ক্রেতা যে দামে কিনছে তার মধ্যে ৯-১০ টাকার ফারাক। এই টাকাটা গিয়ে ঢুকছে মজুতদার ও বৃহৎ ব্যবসাদারদের পকেটে। মন্ত্রী নিজেই বলেছেন, 'এক শ্রেণির মজুতদার ও ফড়ের জন্য বাজারে আলুর দাম বাড়ছে।' মন্ত্রী বলুন, এই অসাধু মজুতদার ও ফড়েদের বিরুদ্ধে সরকার কী ব্যবস্থা নিয়েছেন? বিগত সিপিএম সরকারের মতো নতুন সরকারও কেন আমজনতার পকেট কেটে মজুতদার ও ফড়েদের মুনাফা লোটার কাজ নির্বিবাদে চালিয়ে যেতে দিচ্ছে? সরকার চাষিদের থেকে সরাসরি আলু কিনে বাজারে উপস্থিত করছে না কেন? বাজারে দাম যখন বেড়ে যাচ্ছে, তখন মজুত উদ্ধার করে, অসাধু ফড়ে-মজুতদারদের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নিয়ে দাম নিয়ন্ত্রণ করছে না কেন? সরকারের হাতেই তো 'অত্যাবশ্যকীয় পণ্য আইন' রয়েছে। সেই আইনও যদি তেমন শক্তিশালী না হয়, তবে প্রয়োজনীয় নতুন আইন পাশ করাতে সরকারের আটকাচ্ছে কোথায়?

মন্ত্রী বলছেন, 'বহু বছর পর চাষিরা একটু দাম পাচ্ছেন'। যেন চাষিরা দাম বেশি পাচ্ছে বলেই খুচরো বাজারে দাম বাড়ছে। সাধারণ মানুষের সঙ্গে চাষিদের বিরোধ সৃষ্টি করে সরকার হাত ধুয়ে ফেলতে চাইছে। অথচ চাষিরা বছরের পর বছর বাজারে আলু বিক্রি করে চাষের ন্যূনতম খরচটুকুও পায়নি। ঋণের ফাঁদে আস্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে পড়েছে। কী পূর্বতন সিপিএম সরকার, কী তৃণমূল ও কংগ্রেসের নতুন জোট সরকার কেউই তাদের পাশে একটি বারের জন্যও দাঁড়ায়নি। এ বছর তারা যতটুকু দাম পেয়েছেন তা তাদের ঋণের জাল থেকে বেরনোর পথ করে দিতে পারবে তো? চাষিরা বার বার আলুর দাম না পেয়ে এ বছর কম জমিতে চাষ করেছে। ফলনও হয়েছে কম। পাশাপাশি চাষের খরচ বেড়েছে বিপুল। ফলে যা টাকা চাষি পাবে তাতে বেশিরভাগ চাষির ঋণ শোধ হওয়া দূরে থাক নতুন করে ঋণ করতে হবে। বিগত সরকারের আমলে আলু চাষির আত্মহত্যা প্রায় সাধারণ ঘটনা হয়ে উঠেছিল। এই সরকারের এক বছরেও বেশ কয়েকজন চাষি আত্মহত্যা করেছেন।

আরও খবর, সরকারের কৃষি দফতর ভাবছে, চীন থেকে আলু আমদানি করে রাজ্যে আলুর জোগান বাড়াবে। আলুর দাম তাহলে নাকি কেজি পিছু ১০ টাকায় ধরে রাখা যাবে। অথচ, রাজ্যে এই বছরেও যা উৎপাদন হয়েছে, কৃষি দফতর সূত্রের খবর, তা রাজ্যের চাহিদার থেকেও ২৬ লক্ষ মেট্রিক টন বেশি। সরকারেরই বয়ান, সেগুলির একটি অংশ মজুতদারদের গুদামে এবং আর একটি অংশ অন্য রাজ্যে বিক্রি করে দিচ্ছে ব্যবসায়ীরা। কিন্তু, সরকার মজুত উদ্ধার করবে না, কারণ মজুতদারদের গোঁসা হবে। অন্য রাজ্যে বিক্রিও

ছয়ের পাতায় দেখুন

শিক্ষার অধিকার আইন না শিক্ষা সংহারের নক্সা

সম্প্রতি সুপ্রিম কোর্ট শিক্ষার অধিকার আইনকে আংশিক সাহায্যপ্রাপ্ত এবং বেসরকারি স্কুলগুলিতেও কার্যকর করার রায় ঘোষণা করে বলেছে 'শিক্ষার অধিকার আইন' আসলে শিক্ষার সুযোগ প্রান্তিক ছাত্রদের কাছে পৌঁছে দেওয়ার উদ্দেশ্যেই।

২০১০ সালের ১ এপ্রিল শিক্ষার অধিকার আইন চালু হয় সারা দেশে। এতে ৬ থেকে ১৪ বছর বয়সী শিশুদের স্কুলে ভর্তি বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। আগে থেকেই ঘোষণা হচ্ছিল, অবৈতনিক শিক্ষার আওতায় দেশের সব শিশুকে আনা হবে। প্রধানমন্ত্রী ঘনঘন হাসিমুখে প্রচারমাধ্যমে মুখ দেখিয়ে এর সুফল সম্পর্কে দেশবাসীকে অবহিত করলেন। বললেন, শিক্ষা ক্ষেত্রে বিপ্লব এসেছে। দেশবাসী ভাবল, অভিভাবক হিসাবে আর কোনও চিন্তা থাকল না তাদের, সরকারই সকলের শিক্ষার দায়িত্ব গ্রহণ করবে। কিন্তু শিক্ষার সুযোগ থেকে চিরকাল বঞ্চিত দেশের কোটি কোটি গরিব নিম্নবিত্ত শ্রমিক-মুটে-মজুর-সাধারণ মানুষের আশা কি এতে পূরণ হল?

শিক্ষার অধিকার আইন আসলে কী? আইনে বলা হয়েছে, যারা আর্থিক কারণে স্কুলে ভর্তি হতে পারেনি, তারা ৬ থেকে ১৪ বছরের মধ্যে যে বয়সীই হোক না কেন, তাদের বয়স অনুযায়ী ক্লাসে ভর্তির ব্যবস্থা করতে হবে। এমনকী কেউ পড়াশুনা মাঝপথে ছেড়ে দিয়ে কিছুদিন পরে আবার পড়তে চাইলে তাকে বয়স অনুযায়ী উঁচু ক্লাসে ভর্তি নিতে হবে। আগের ক্লাসগুলিতে তাকে পড়ে পাশ করে আসতে হবে না। যে ছাত্রটি এইভাবে লাফ দিয়ে কয়েক ক্লাস পরে ভর্তি হল সে আদতে কিছু শিখল কি না এগুলি বিচার করা হবে না। ছাত্রছাত্রীদের ভবিষ্যৎ নিয়ে যাঁরা একটু ভাবেন তাঁরা সকলেই বলছেন এর ফলে শিক্ষার মানের অবনমন অনিবার্য।

এই আইন মোতাবেক দেশের সমস্ত বেসরকারি স্কুলে ২৫ শতাংশ আসন গরিব ছাত্রদের জন্য সংরক্ষিত রাখা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। মনে হতে পারে, যে সব নামীদামী বেসরকারি স্কুলে গরিব ঘরের ছেলেমেয়েরা ভর্তির সুযোগ পেত না, এই আইন তাদের সেই সুযোগ করে দিল। কিন্তু যে শিক্ষা ব্যবসায়ীরা বিরাট পুঁজি খাটিয়ে লাভ করতে নেমেছে, তারা সে কথা মানবে কেন? ঐ আসনগুলি বেচে যে তাদের অনেক টাকা আসবে! কোনও স্কুল বলছে, মান বজায় রাখার জন্যই তারা ঐ আইন মানবে না। সম্প্রতি অ্যাসোসিয়েশন অফ হেডস অফ অ্যাংলো ইন্ডিয়ান স্কুলস বলছে, তারা পাশ-ফেল রাখবে। তারা সরকারি অনুদান চায় না, তারা ঐ আইনের আওতায় থাকবে না।

আইনের গোড়াতেই বলা হয়েছে, দেশের সমস্ত অংশের মানুষ তাঁদের সন্তানদের স্কুলে দিতে বাধ্য থাকবে। স্কুলে না পাঠানো শাস্তিযোগ্য অপরাধ। যেন এতদিন এই ছেলেমেয়েরা স্কুলে যেতে পারেনি বাবা-মায়েদের বাধায়। প্রত্যেক বাবা মা-ই চান তাঁদের সন্তানকে স্কুলে পাঠাতে। সরকারি হিসাবেই প্রাথমিক স্তরে ৪৬ শতাংশ ছাত্রছাত্রী ড্রপআউট হয়। দারিদ্রের কারণেই যে এত বিপুল ড্রপ আউট, এ কথা কি সরকারের অজানা? তাঁদের এই আর্থিক দুরবস্থার কোনও সুরাহা না করেই এমন নির্দেশিকা তাঁদের প্রতি নির্মম কৌতুক নয় কি?

আইন অনুযায়ী, ছাত্র ও শিক্ষকের অনুপাত ৩০:১ হতে হবে। যা এতদিন ছিল ৮০:১ বা তারও বেশি। ছাত্রের সংখ্যা ২২ কোটি হলে হিসাব অনুযায়ী শিক্ষকের সংখ্যা দাঁড়ায় ৭৩ লক্ষ ৩৩ হাজার ৩৩৩ এর কিছু বেশি। এ দিকে খোদ কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী বলেছেন, দেশে প্রয়োজনের তুলনায় শিক্ষকের সংখ্যা ৬ লক্ষ কম। এই বিপুল সংখ্যক শিক্ষক নিয়োগের বিষয়ে আইনের কোথাও কোনও কথা বলা নেই। শুধু তাই নয়, রাজ্য সরকারগুলি তাদের কোষাগারের অপ্রতুলতার অজুহাত সহ নানা কারণে শিক্ষক নিয়োগ প্রায় করছেই না বা বিলম্বিত করছে। তাছাড়া, শুধুমাত্র ছাত্র-শিক্ষকের অনুপাত কমালেই শিক্ষার মানের উন্নতি করা যাবে না। তার জন্য শিক্ষার অন্যান্য উপকরণ, উন্নত ও বিজ্ঞানভিত্তিক সিলেবাস তৈরি, লাইব্রেরি, সর্বোপরি স্কুল বিল্ডিং, পানীয় জল ও শৌচাগারের ন্যূনতম ব্যবস্থা করতে হয়। অথচ স্কুলগুলির পরিস্থিতি কী? এক সার্ভে রিপোর্টে জানা গেছে, দেশে ১ লাখ ৪৮ হাজার ৬৯৬টি স্কুলের বিল্ডিংই নেই। পানীয় জল নেই ১ লাখ ৬৫ হাজার ৭৪২ টি স্কুলে। ৪ লাখ ৫৫ হাজার ৫৬১টি স্কুলে শৌচাগার নেই। শিক্ষকের সংখ্যা কত? সারা দেশের মধ্যে ৮টি রাজ্যেই ক্লাসগুলিতে পড়ানোর জন্য উপযুক্ত শিক্ষক ৫০ শতাংশেরও কম। ১ লাখ ১৪ হাজার ৫৩১টি প্রাইমারি স্কুলে ১ জন করে শিক্ষক আছেন। শিক্ষার অধিকার আইন প্রয়োগের মাধ্যমে সরকারের সকলের জন্য শিক্ষার পরিকল্পনা কতটা আন্তরিক তা নিয়ে প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক।

শিক্ষার অধিকার আইনে বলা হয়েছে, তিন বছরের মধ্যে স্কুল কর্তৃপক্ষ এই পরিকাঠামোগত উন্নয়ন না করতে পারলে স্কুলটি অনুমোদন হারাবে। স্কুল উঠে গেলে তো শিক্ষাক্ষেত্রকে আরও সংকুচিত করা হবে। অন্য দিকে পরিকাঠামোগত উন্নয়নের নামে স্কুল কর্তৃপক্ষ ছাত্রদের উপর আরও মাইনের বোঝা চাপাবে, যা অনেক অভিভাবকই বহন করতে পারবেন না। ফলে স্কুলছুটের সংখ্যা বাড়বে। সর্বশিক্ষা অভিযান গত দু'দশক ধরে চলার পর তার ভয়ঙ্কর পরিণাম কারওরই অজানা নয়। লাফিয়ে বেড়েছে ড্রপ আউটের হার। সরকার খুশি হতে পারে, কিন্তু বাস্তব সত্য হল এক কোটি পঞ্চাশ লক্ষ শিশুর শিক্ষার সাথে কোনও সম্পর্ক নেই, পেটের ভাত জোগাড়ের জন্য তারা কোনও না কোনও কাজে ঢুকতে বাধ্য হয়েছে।

শিক্ষা নিয়ে সরকারগুলির দৃষ্টিভঙ্গি কী, তা বোঝা যায় এই আইনের আর একটি ধারা দেখে। তাতে আছে, যে সমস্ত স্কুলে ১৫০ জনেরও কম ছাত্র, সেখানে প্রধান শিক্ষক থাকবে না। স্কুলের পরিচালনা, কাজের সমন্বয় প্রভৃতি বিষয় প্রধান শিক্ষক ছাড়া কী করে সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হতে পারে? শিক্ষাদান ছাড়াও শিক্ষকদের বহুরকমের সরকারি কর্মসূচি, খেলাধূলা, মিড ডে মিলের ব্যবস্থাপনা, জনগণনা, ভোটার লিস্ট তৈরি করা, নির্বাচন পরিচালনা ইত্যাদি কাজে লাগানোর কথা আইনেই রাখা হয়েছে। ফলে বোঝাই যায়, ছাত্রদের পড়ানোর কাজটা হবে নিতান্তই অবহেলিত।

আইন অনুযায়ী, অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত পাশ-ফেল ব্যবস্থা রাখা চলবে না। শিক্ষাব্যবস্থার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ মূল্যায়ন। এ কথা অস্বীকার করা যায় না যে, স্কুলের পরীক্ষাই বছরের কিছু সময়ের জন্য বহু শিক্ষার্থীকে পাঠমুখী করে। পাশ-ফেল তুলে দিলে ছাত্ররা উঁচু ক্লাসে উঠবে ঠিকই, কাগজে-কলমে শিক্ষিতও হবে, কিন্তু বাস্তবে কিছু শিখবেও না, শিক্ষান্তে তাদের কর্মসংস্থানও হবে না। কারণ, চাকরির জন্য পরীক্ষায় পাশ করতে হয়। পশ্চিমবঙ্গের মানুষ তাদের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকে জানেন, সিপিএম ফ্রন্ট সরকার চতুর্থ শ্রেণি পর্যন্ত পাশ-ফেল তুলে দেওয়ার ফলে প্রাথমিক স্কুলগুলির হাল কী শোচনীয় অবস্থায় পৌঁছেছে। পাশ-ফেল তুলে দেওয়ার সময় সিপিএম নেতারা বলেছিলেন, স্কুলে ড্রপ আউট কমানোর জন্য তাঁরা এ কাজ করছেন। দেখা গেল পাশ-ফেল তুলে দেওয়ার পর ড্রপ আউট বেড়েছে বহুগুণ। অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত পাশ-ফেল তুলে দিলে পরিস্থিতি কী দাঁড়াতে পারে, তা সহজেই অনুমেয়।

আইনের শর্ত অনুযায়ী সারা দেশের ছাত্রদের শিক্ষার জন্য কেন্দ্র ও রাজ্যের আনুমানিক ব্যয়ভারের অনুপাত ৬৫:৩৫। এই আইন প্রয়োগের জন্য গত ৫ বছরে ২.৩ লক্ষ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয় শিক্ষামন্ত্রকের পক্ষ থেকে। এর পরে এই প্রকল্পে ব্যয় হবে কীভাবে? কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী কোনও রাখঢাক না রেখেই বলেছেন, 'সরকারের হাতে কোনও যাদুকাঠি নেই যার ছোঁয়ায় শিক্ষা মসৃণভাবে চলতে পারে। সরাসরি সরকারের কাঁধ থেকে আর্থিক দায়িত্ব ঝেড়ে ফেলে তিনি বলেছেন 'ফান্ডের জন্য একটা যৌথ সংস্থা করে অভিভাবক, স্কুলের প্রতিবেশী, শিক্ষক, শুভানুধ্যায়ী, ম্যানেজিং কমিটি, রাজ্য সরকার, পঞ্চায়েত, কেন্দ্রীয় সরকার এমনকী যে ছাত্ররা শিক্ষার আওতায় আসবে তারাও ফান্ড জোগাবে।' সরকার শিক্ষার অধিকার দিতে কতটা আগ্রহী তা এর থেকেই পরিষ্কার।

এই আইনে বুনিয়াদি শিক্ষাকে অবহেলা করা হলেও ছাত্রদের কারিগরি শিক্ষায় শিক্ষিত করার কথা বলা হয়েছে। কিন্তু শিক্ষা নিয়ে যারা বিন্দুমাত্রও চর্চা করেন, তাঁরা জানেন বুনিয়াদি শিক্ষা না থাকলে ছাত্রদের মধ্যে বিশ্লেষণী ক্ষমতা গড়ে ওঠার পথ সঙ্কুচিত হয়ে যায়। আবার শিক্ষাজীবন শেষ হওয়ার পর 'নিজেই নিজেকে কাজ দাও' এই স্লোগান তোলা হচ্ছে সেল্ফ এমপ্লয়মেন্ট স্কিমের মধ্য দিয়ে। বড় বড় কলকারখানা যেখানে ধুঁকছে, সেখানে সেল্ফ এমপ্লয়মেন্টের মাধ্যমে বেকার যুবকরা দু'মুঠো গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থাও করতে পারবে না। কিন্তু সরকার এমনভাবে শিক্ষা ব্যবস্থাকে সাজাচ্ছে যাতে কাজ না পেলে হতাশ যুবকরা নিজেরাই নিজেদের দায়ী করবে, সরকার সহজেই দায় অস্বীকার করতে পারবে।

শিক্ষার কেন্দ্রীকরণের নামে শিক্ষার নিয়ম-নীতি সহ সমস্ত কিছু সরকারিভাবে গোটা দেশের উপর চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে, না মানলে শিক্ষাক্ষেত্রে রাজ্যের বরাদ্দ ছাঁটাই করার প্রস্তাবও রয়েছে আইনে। বাস্তবে শিক্ষা যে কেন্দ্র-রাজ্য যৌথ তালিকাভুক্ত তাও অস্বীকার করা হচ্ছে। এ ছাড়া এই আইন প্রয়োগে শিক্ষার স্বাধিকার খর্ব হবে। ফলে রাজ্যের অধীনে শিক্ষার যে সমস্ত স্বশাসিত সংস্থা ছিল, তাদের আপাত অর্থে যতটুকুও প্রগতিশীল পদক্ষেপ নেওয়ার অধিকার ছিল, তা আর থাকল না। এ ছাড়া প্রতিটি রাজ্যের নিজ নিজ বৈশিষ্ট্য, ভাষার বিভিন্নতা এবং ইতিহাসের ভিন্ন প্রেক্ষাপটের জন্য সিলেবাস তৈরির স্বাধীন অধিকার রাজ্যগুলির থাকা দরকার, যা এই আইন প্রয়োগে চূড়ান্তভাবে খর্ব হবে। তাছাড়া এই আইনের বিরুদ্ধে রাজ্যে রাজ্যে প্রতিবাদ আন্দোলন হলে তা 'কেন্দ্রের এক্তিয়ারভুক্ত' এই অজুহাত দিয়ে নিজেদের দায় এড়াতে চাইবে রাজ্য সরকারগুলিও।

শিক্ষার অধিকার আইন অনুযায়ী কেন্দ্রের কংগ্রেস সরকারের পাশ-ফেল তুলে দেওয়ার সিদ্ধান্তের বহু পূর্বেই এ রাজ্যের সিপিএম সরকার তা তুলে দিয়েছিল, ছাত্রদের উপর বিপুল পরিমাণ ফি-র বোঝা চাপিয়েছিল। এভাবে শিক্ষাকে সার্বিক ভাবে সংকোচন করেছিল। ফলে, শিক্ষার অধিকার আইন নিয়ে সিপিএমের কোনও মৌলিক বিরোধিতা থাকতে পারে না, বাস্তবে নেই-ও। সে জন্যই সে সময় এ রাজ্যে ক্ষমতায় থাকার সুবাদে তারা কেন্দ্র-রাজ্যের ব্যয়ভারের অনুপাত ৬৫ : ৩৫-এর খরচের বিষয়টি ছাড়া কোথাও কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে ভিন্নমত পোষণ করেনি। এর থেকেই বোঝা যায়, দক্ষিণপন্থী কংগ্রেস ও বামপন্থী নামধারী সিপিএমের শিক্ষা সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গিতে কোনও ফারাক নেই।

এভাবে শিক্ষার অধিকারের কথা বলে বাস্তবে শিক্ষাসংহারই করা হচ্ছে সুপরিকল্পিতভাবে। শিক্ষাপ্রেমী মানুষ কি মেনে নেবেন এই সিদ্ধান্ত? ইতিমধ্যেই শিক্ষক-শিক্ষাবিদরা এর প্রতিবাদ জানিয়েছেন। ছাত্র-অভিভাবকদেরও সোচ্চার হতে হবে এর বিরুদ্ধে।

আলুর দামবৃদ্ধি

পাঁচের পাতার পর

সরকার আটকাবে না, কারণ ব্যবসাদাররা চটে যাবে।

অদূর ভবিষ্যতে রাজ্যের হিমঘরগুলো থেকে আলু বেরোবে। এই আলু চাষিদের থেকে চার, সাড়ে চার টাকা কেজি দরে কিনে হিমঘরে ঢুকিয়েছে ব্যবসাদারেরা। এগুলো কী দরে বিক্রি হবে? চীনা আলু যদি ১০ টাকা কেজি দরে বিক্রি হয়, তবে হিমঘর থেকে বেরোনো আলুও নিশ্চয় তার নিচে নামবে না। অর্থাৎ ব্যবসাদাররা দ্বিগুণেরও বেশি দরে বেচে দেদার মুনাফা লুটবে। সরকার সেই ব্যবস্থাটাই করে দিচ্ছে।

দেখা যাচ্ছে, আলুচাষি বা ক্রেতা-সাধারণের স্বার্থরক্ষা নয়, মজুতদার ও বৃহৎ ব্যবসাদারদের খুশি রাখাই সরকারের লক্ষ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই জন্যই কি রাজ্যের সাধারণ মানুষ সিপিএম-এর পরিবর্তে তৃণমূলকে রাজ্যের ক্ষমতায় বসিয়েছিল?

কমরেড চন্দ্রলেখা দাস আসাম রাজ্য কমিটির নতুন সম্পাদক

এস ইউ সি আই (সি) আসাম রাজ্য কমিটির নতুন সম্পাদক হিসেবে, দলের স্টাফ মেম্বার কমরেড চন্দ্রলেখা দাসের নাম প্রস্তাব করেছে আসাম রাজ্য কমিটি এবং কেন্দ্রীয় কমিটি তা অনুমোদন করেছে। কেন্দ্রীয় কমিটি আশা করে, রাজ্য কমিটির সকল সদস্য এবং অন্যান্য সকল কমরেডদের আন্তরিক সহায়তায় তিনি তাঁর দায়িত্ব যোগ্যতার সঙ্গে পালন করতে সক্ষম হবেন।

বিপ্লবী অভিনন্দন সহ
দেবপ্রসাদ সরকার
অফিস সম্পাদক, কেন্দ্রীয় কমিটি

নতুন ট্রান্সফরমারের দাবিতে ভাঙড়ে অবরোধ

খারাপ ট্রান্সফরমারের পরিবর্তনের দাবিতে ৩ এপ্রিল ভাঙড়ের কাঁঠালবেড়িয়া গ্রামের শতাধিক বিদ্যুৎ গ্রাহক স্টেশন ম্যানেজারের অফিস অবরোধ করেন। ৫ ঘণ্টা ধরে অবরোধ চলে। অবশেষে ডি ই নতুন ট্রান্সফরমার বসানোর প্রতিশ্রুতি দিলে গ্রাহকরা অবরোধ তুলে নেন। অ্যাবেকা ভাঙড় শাখার সম্পাদক জলিল ঢালি অবরোধে নেতৃত্ব দেন।

প্রতিশ্রুতি ছিল ৫ বছরে ১০ লক্ষ বেকারের চাকরির

মুখ্যমন্ত্রী বলছেন বেকাররা কাজ খুঁজে নিক

১৩ এপ্রিল দুর্গাপুরে এক মেলা উদ্বোধন অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জী বলেছেন, 'বেকার যুবকরা চাকরির অপেক্ষায় না থেকে নিজে নিজে কাজ খুঁজে নিন। বলেছেন, শুধু সরকারি চাকরিই কি কাজ! চাকরি না পেলে চা বিক্রি করুন! বিড়ির দোকান করুন। খাতা তৈরি করুন। কত কাজ আছে খুঁজে নিলেই হয়'' (আনন্দবাজার-১৪-০৪-২০১২)।

এ কথা শুনে কারও মনে হতেই পারে দেশে চাকরির অভাব নেই। বেকারত্বের যে কথা বলা হয়, তা ভিত্তিহীন। আরও মনে হতে পারে তীব্র বেকারত্বের জন্য বেকাররাই দায়ী; দায়ী তাদের কর্মবিমুখ মানসিকতা, সর্বোপরি সরকারি চাকরি পাওয়ার জন্য অধীর অপেক্ষায় বসে থাকা। কিন্তু বাস্তবটা তা নয়। ঘরে ঘরে বেকাররা একটা সাধারণ কাজ জোগাড় করার জন্য কী প্রাণপাত চেষ্টাই না করছেন। ফলে 'কত কাজ' বলে মুখ্যমন্ত্রী যে কথা বলেছেন তা সত্যের প্রতিফলন নয়। তার এই ঘোষণায় স্বাভাবিকভাবেই বেকার যুবক-যুবতীরা হতাশ। কারণ ক্ষমতায় আসার আগে মুখ্যমন্ত্রী প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, '৫ বছরে ১০ লক্ষ বেকারের চাকরি হবে'। বেকার যুবকরা অপেক্ষায় ছিলেন, মুখ্যমন্ত্রী হয়তো তাদের জন্য কিছু করবেন। কিন্তু চাকরি দেওয়া দূরস্থান, এখন বলছেন, 'খুঁটে খাও', সরকার চাকরি দিতে পারবে না।

এ কথা ঠিক, চাকরি দেব বললেই চাকরি দেওয়া যায় না। চাকরি দেওয়ার জন্য শিল্প চাই, কলকারখানা চাই, সরকারি শূন্য পদগুলিতে নিয়োগ চাই, পদ বিলোপ না করে নতুন নতুন পদ সৃষ্টি করা চাই। কিন্তু কেন্দ্র বা রাজ্যস্তরে সরকারি ভূমিকা এর বিপরীত।

ধরা যাক সি পি এম সরকারের কথা। এ রাজ্যে প্রতিবছর প্রায় ১২ হাজার রাজ্য সরকারি কর্মচারী অবসর নেন। এই পদগুলিতে যোগ্য বেকারদের নিয়োগ না করে সিপিএম সরকার অবসরপ্রাপ্তদেরই একটা অংশকে পুনর্নিয়োগ করেছে। ক্ষমতাসীন হওয়ার পর তৃণমূল সরকারও সিপিএমের পথেই হাঁটতে শুরু করেছে। নতুন সরকারের প্রথম ৮ মাসের মধ্যেই মহাকরণ থেকে ধাপে ধাপে নির্দেশ জারি করা হল প্রায় ১০ হাজার শূন্যপদে অবসরপ্রাপ্তদের নিয়োগের জন্য। এই পদগুলিতে ১০ হাজার বেকারকে কি নিয়োগ করা যেত না? ১০ হাজার পরিবার তো অন্তত চূড়ান্ত মূল্যবৃদ্ধির বাজারে খানিকটা স্বস্তি পেত। রাজ্যে প্রায় আড়াই লক্ষ সরকারি শূন্য পদ রয়েছে। সিপিএম আমল থেকে এগুলিতে নিয়োগ প্রায় বন্ধ। সেগুলিকে ধীরে ধীরে বিলুপ্ত করে দেওয়ার যে বিশ্বায়ন নির্ধারিত ফরমূলা মনমোহন সিংয়ের সরকার গ্রহণ করেছে, তাকেই মেনে চলেছে সিপিএম। এখন ক্ষমতাসীন হয়ে তৃণমূলও সে পথেই চলেছে।

সকলেই জানেন, কাজ পাওয়া যাবে প্রতিষ্ঠিত শিল্পগুলি চালু থাকলে এবং নতুন নতুন শিল্প গড়ে উঠলে। একসময় পশ্চিমবঙ্গ ছিল শিল্প তালিকার প্রথম দিকে। হুগলি শিল্পাঞ্চল, হাওড়া শিল্পাঞ্চল, ব্যারাকপুর শিল্পাঞ্চল, কল্যাণী শিল্পাঞ্চল, দুর্গাপুর শিল্পাঞ্চলে হাজার হাজার মানুষ কাজ করত। এখন এগুলি খাঁ খাঁ করছে। গঙ্গার দু'ধারে এখন কারখানার চিমনিতে ধোঁয়া নেই। এ রাজ্যে ৬০ হাজারেরও বেশি ছোটবড় কলকারখানা বন্ধ। লক্ষ লক্ষ শ্রমিক ছাঁটাই হয়ে ক্রমবর্ধমান বেকারবাহিনী আরও বাড়াচ্ছে। বন্ধ কলকারখানা খোলার ক্ষেত্রে সিপিএম সরকারের কোনও উদ্যোগই প্রায় ছিল না। তৃণমূল সরকারেরও এ ক্ষেত্রে এখন পর্যন্ত কোনও তৎপরতা বিশেষ লক্ষ করা যাচ্ছে না।

আবার নতুন শিল্পও তেমন গড়ে উঠছে না। পুঁজিবাদের চূড়ান্ত বাজার সঙ্কটের বর্তমান সময়ে শিল্পায়নও সম্ভব নয়। শিল্প গড়ে ওঠার রাস্তায় বাধা হিসাবে দাঁড়িয়ে আছে পুঁজিবাদী ব্যবস্থা নিজেই। এই অবস্থায় সিপিএম বেকার যুবকদের আশা দেখাতে শুরু করল, তারা এই রাজ্যের শিল্পে জোয়ার আনবে। 'শিল্প কি আকাশে হবে' — এই ধুয়ো তুলে সিপিএম শিল্পায়নের নামে হাজার হাজার একর উর্বর কৃষিজমি দখল করতে গিয়ে সিঙ্গুর-নন্দীগ্রাম কাণ্ড ঘটাল। অথচ রাজ্যের বন্ধ ও রুগ্ন ৫০০ কারখানাতেই যে ৪০ হাজার একর উদ্বৃত্ত জমি পড়ে রয়েছে সেগুলিতে কেন শিল্প করার জন্য একটি ইটও গাঁথা হল না বিগত ৫০ বছরে? তার কোনও জবাব সিপিএম দিল না। ফলে তাদের শিল্পায়নের হুজুগের মধ্যে মানুষ দেখতে পেয়েছে পুঁজিপতিদের জন্য জমি দখলের তৎপরতা। কৃষকের জমি বন্দুকের জোরে দখলের পরিণামে সিপিএম ক্ষমতাচ্যুত হল। ক্ষমতাসীন তৃণমূল সরকারেরও শিল্প সম্পর্কে কোনও পরিষ্কার ঘোষিত নীতি লক্ষ করা যাচ্ছে না। কিছু 'মউ' অবশ্য তারা শিল্পপতিদের সঙ্গে করছে। কিন্তু তাতে কতজন চাকরি পাবে, সেই মউয়ের শর্তই বা কী তা স্পষ্টরূপে জনসমক্ষে বলছে না। এই প্রেক্ষাপটে মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন, বেকাররা সরকারি চাকরির অপেক্ষায় না থেকে চা বিক্রি করুক, বিড়ি বিক্রি করুক, যেমন আগের সিপিএম সরকারের মন্ত্রীরা বলেছেন বেকাররা তেলেভাজা বিক্রি করুক।

বেকার যুবকদের প্রতি প্রতারণা এখানেই শেষ নয়। আগের সিপিএম সরকার যেমন বেকার সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে 'স্বনিযুক্তি প্রকল্প'-এর উপর জোর দিয়েছে, বর্তমান সরকারও সে পথেই হাঁটছে এবং মুখ্যমন্ত্রী দুর্গাপুরের ভাষণে তা স্পষ্টই বলে দিয়েছেন। স্বনিযুক্তি প্রকল্পে পূর্বতন সিপিএম সরকার বেকারদের কয়েক হাজার টাকা করে ঋণ দিয়েছিল। সেই ঋণ নিয়ে তারা যে ব্যবসাই করতে গেছে, বৃহৎ পুঁজির সাথে তীব্র প্রতিযোগিতায় তারা কিছু করতে পারে নি। বরং জড়িয়েছেন ঋণের জালে। পরে ঋণ শোধের জন্য ব্যাঙ্কের বারংবার তাগাদা ও ঋণ শোধ করতে না পারায় পুলিশি জুলুমের মধ্যে পড়তে হয়েছে। স্বনিযুক্তি প্রকল্প আসলে ঋণের জালে বেকারদের আটকে দেওয়ার প্রকল্প। এটা বেকারদের কোনও উপকারই করে না।

প্রতিশ্রুতি পূরণ না করে স্বনিযুক্তির সান্ত্বনায় বেকার যুবক-যুবতীরা কিন্তু ভুলবে না, তারা ক্ষুব্ধ ক্রুদ্ধ হবেই। চাকরির দাবিতে তারা রাস্তায় নামবেই। কারণ পেট বড় বালাই।

প্রকাশিত হল

মার্কসবাদী বিচারধারায়
ভারতীয় নবজাগরণের পথিকৃৎ
ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর
প্রভাস ঘোষ
মূল্য ঃ ১৫ টাকা

পার্টি দরদীর জীবনাবসান

বিশিষ্ট আইনজীবী এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর সাথে বিশেষ ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে আবদ্ধ কমরেড বিনয় রায় ১৮ মার্চ সন্ধ্যা ৬টায় নীলরতন সরকার হাসপাতালে রেনাল ফেলিওরের ফলে মারা যান। তাঁর ৭৭ বছর বয়স হয়েছিল। ৫০-এর দশকে দক্ষিণ কলকাতার কালীধন ইনস্টিটিউশনে ছাত্র অবস্থায় দলের বর্তমান সাধারণ সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব হয় এবং তাঁরই মাধ্যমে এ যুগের বিশিষ্ট মার্কসবাদী চিন্তানায়ক কমরেড শিবদাস ঘোষের চিন্তার সংস্পর্শে আসেন এবং দলের সঙ্গে যুক্ত হয়ে সক্রিয়ভাবে কাজকর্ম শুরু করেন।

তিনি ১৯৫১ থেকে ১৯৬১ সাল পর্যন্ত দলের কর্মী হিসাবে সক্রিয় ছিলেন। দলের কিশোর সংগঠন কমসোমল-এ যুক্ত ছিলেন প্রতিষ্ঠার সময় থেকেই। তিনি ছাত্র সংগঠন এ আই ডি এস ও-র প্রথম পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯৫৩ সালে ঐতিহাসিক ট্রাম ভাড়া বৃদ্ধি প্রতিরোধ আন্দোলন, ১৯৫৪ সালে শিক্ষক আন্দোলন, ১৯৫৫ সালে গোয়া মুক্তি আন্দোলন, ১৯৫৬ সালে বঙ্গ-বিহার সংযুক্তি বিরোধী আন্দোলন, ১৯৫৮ সালে ছাত্রদের ফি বৃদ্ধি প্রতিরোধ আন্দোলন এবং ১৯৫৯ সালের খাদ্য আন্দোলনে তিনি সক্রিয়ভাবে অংশ নিয়েছিলেন। সেই সময়ে দলের স্বল্প পরিচিতির দিনে রাস্তায় ফান্ড কালেকশন, দলের মুখপত্র গণদাবী বিক্রি, পোস্টারিং, বস্তিতে স্কুল চালানো ইত্যাদি সব কাজই নিষ্ঠার সাথে করেছেন। দক্ষিণ কলকাতার লেক টেম্পল রোডে যে 'কালচার ক্লাব'কে কেন্দ্র করে এস ইউ সি আই (সি) দলের কাজের সূচনা হয়, পরবর্তীকালে দল কমরেড বিনয় রায়কে সেই ক্লাব পরিচালনার দায়িত্ব দেয় এবং দীর্ঘদিন তিনি যোগ্যতার সাথে সে দায়িত্ব পালন করেছেন।

নিপীড়িত নারী সমাজ তথা সমস্ত স্তরের অত্যাচারিত মানুষকে সাহায্য করার লক্ষ্য নিয়ে তিনি প্রতিষ্ঠা করেন লিগ্যাল সার্ভিস সেন্টার। পরবর্তীকালে তিনি তার সভাপতি এবং উপদেষ্টা হন।

নাট্য চর্চার প্রতি তাঁর প্রবল আগ্রহ ও আবেগ ছিল। অল্প কিছুদিন সরকারি চাকরি করার পর স্বাধীনভাবে জীবন নির্বাহ ও নাট্য চর্চা অব্যাহত রাখার জন্য তিনি আইনজীবীর পেশা গ্রহণ করেন এবং নিজ দক্ষতায় স্বল্প সময়েই প্রতিষ্ঠিত হন। সুখে-দুঃখে-দুর্যোগে পার্টির বৃহৎ পরিবারের একান্ত আপনজন হয়ে ছিলেন। পারিবারিক জীবনে থেকেও কীভাবে দৃঢ়তা ও নিষ্ঠার সাথে বৈপ্লবিক আদর্শকে জীবনে অনুসরণ করা যায়, তারই এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত তিনি রেখে গেছেন।

৫ এপ্রিল কলকাতার শরৎসদনে লিগ্যাল সার্ভিস সেন্টারের আহ্বানে অনুষ্ঠিত স্মরণসভায় কমরেড বিনয় রায়ের আকৈশোর বন্ধু এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট) দলের সাধারণ সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ, কলকাতা ও বোম্বে হাইকোর্টের পূর্বতন প্রধান বিচারপতি চিত্ততোষ মুখার্জী, সারা ভারত বার কাউন্সিলের প্রাক্তন চেয়ারম্যান বিশ্বনাথ বাজপেয়ী প্রেরিত শোকবার্তাগুলি পাঠ করা হয়। কমরেড প্রভাস ঘোষ তাঁর শোকবার্তায় বলেন, 'কমরেড বিনয় রায়ের মৃত্যু আমার কাছে এবং আমাদের দলের কাছে কী গভীর বেদনার, তা ভাষায় ব্যক্ত করা কঠিন। মূল্যবোধ ও মনুষ্যত্বের অভাবজনিত আজকের সঙ্কটময় দিনে কমরেড বিনয় রায় এক বিরল চরিত্র ছিলেন। সমাজদেহের স্তরে স্তরে আজ যে ব্যাপক অধঃপতন ঘটছে, নীতি-নৈতিকতা-মানবিকতা বিসর্জন দিয়ে যে ভাবেই হোক অর্থ রোজগার ও ভোগ বিলাসে মত্ত থাকার যে নোংরা স্রোত বইছে, যার পঙ্কিলতা এক সময়ের সম্মানীয় শিক্ষকতা-চিকিৎসা-আইনজগতকেও আজ গ্রাস করছে, তখন এই দৃষ্টিভঙ্গি ও প্রভাব থেকে যে স্বল্পসংখ্যক মানুষ নিজেদের মুক্ত রাখতে পেরেছিলেন, কমরেড বিনয় রায় তাঁদের অন্যতম। তিনি ভদ্র, বিনয়ী ও পরিচ্ছন্ন মনের মানুষ ছিলেন। সততা, হৃদয়ের প্রশস্ততা, নিঃস্বার্থ পরোপকার, কর্তব্যপরায়ণতা এসব দুর্লভ গুণের তিনি অধিকারী ছিলেন।' সংগঠনের সভাপতি, প্রাক্তন বিচারপতি মলয় সেনগুপ্তর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত ঐ সভায় বক্তব্য রাখেন সংগঠনের সম্পাদক ভবেশ গাঙ্গুলী, সারা ভারত মহিলা সাংস্কৃতিক সংগঠনের সভানেত্রী ছায়া মুখার্জী ও পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির সভানেত্রী সাধনা চৌধুরী এবং আরও অনেকে।

কমরেড বিনয় রায় লাল সেলাম

অগ্নি-৫

একের পাতার পর

যুক্তরাষ্ট্র পারমাণবিক অস্ত্র তৈরির মিথ্যা অজুহাতে ইরাককে গুঁড়িয়ে দিল, ইরানের পরমাণু প্রকল্প নিয়ে যে এত 'উদ্বিগ্ন', উত্তর কোরিয়া এমনকী উপগ্রহ পাঠাতে চাইলেও যে ভূত দেখে, সে ভারতের পরমাণু অস্ত্রবাহী এমন মহাস্ত্র উৎক্ষেপণেও কোনও ক্রোধ প্রকাশের পরিবর্তে বাহবা দিল।

হায় রে সিপিআই-সিপিএমের মার্কসবাদ! এই দুই দলের নেতারা অগ্নি উৎক্ষেপণে প্রবল আহ্লাদ প্রকাশ করেছেন। ইতিপূর্বে ভারত কর্তৃক পরমাণু বোমার পরীক্ষামূলক বিস্ফোরণের সময় এই দুই দলকে একই ভূমিকায় দেখা গিয়েছিল। তারা একে ভারতীয় বিজ্ঞানীদের সাফল্য বলে দেখিয়ে এর শ্রেণিচরিত্র নির্ধারণের মূল ইস্যুকে চালাকির দ্বারা এড়িয়ে যেতে চেষ্টা করে। ভারতের মতো একটি শোষণমূলক পুঁজিবাদী রাষ্ট্রের দমনমূলক ক্ষমতাবৃদ্ধিতে যে অস্ত্র প্রকল্প সাহায্য করে, তার সাম্রাজ্যবাদী আকাঙ্খা পূরণে যে সফল 'ক্ষেপণাস্ত্র উৎক্ষেপণ' মদত দেয়, তার মধ্যে বিজ্ঞানীর সাফল্য দেখতে পাওয়া, আর যা-ই হোক, প্রকৃত মার্কসবাদীদের কাজ নয়। অতীতের মতো এ বারও সিপিআই-সিপিএম নেতৃত্বের প্রতিক্রিয়া বুঝিয়ে দিল, মার্কসবাদী আলখাল্লা পরা এই দুটি দলের মূল দৃষ্টিভঙ্গি বুর্জোয়া কংগ্রেস-বিজেপির থেকে আলাদা কিছু নয়।

ফলে এ কথা স্পষ্ট যে, এই উৎক্ষেপণের সাথে দেশের স্বার্থ, দেশের কোটি কোটি সাধারণ মানুষের স্বার্থের কোনও সম্পর্ক নেই। বরং এই উৎক্ষেপণ তাদের জীবনের দুর্দশাকেই আরও বাড়িয়ে তুলবে। কারণ, এই উৎক্ষেপণ এতদঞ্চলে অস্ত্র প্রতিযোগিতাকে আরও বাড়িয়ে তুলবে। সরকারও সাধারণ মানুষের খাদ্য-স্বাস্থ্য-শিক্ষার বরাদ্দ আরও কমিয়ে সামরিক বরাদ্দ ক্রমাগত বাড়াতে থাকবে — যা সাধারণ মানুষের জীবনকে করে তুলবে আরও দুর্বিষহ, নামিয়ে আনবে আরও দুর্ভোগ, আরও বেশি যন্ত্রণা, সাথে সাথে যুদ্ধ উত্তেজনা।

R.N.I. No 5268 / 60
Postal Registration No. KOL / RMS / 138 / 2010-12

কমরেড কিম ইল সুঙ জন্মশতবর্ষ অনুষ্ঠানে কমরেড মানিক মুখার্জী

সমাজতান্ত্রিক উত্তর কোরিয়ার বিপ্লবের রূপকার, প্রথম রাষ্ট্রপতি কমরেড কিম ইল সুঙের জন্মশতবর্ষ উদযাপন উপলক্ষে উত্তর কোরিয়ার ওয়ার্কার্স পার্টি গত ১১ থেকে ১৬ এপ্রিল পিয়ংইয়ঙে ৭ দিন ব্যাপী বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিল। এতে যোগ দেওয়ার জন্য তাঁরা আন্তর্জাতিক সাম্রাজ্যবাদবিরোধী কমিটির সাধারণ সম্পাদক, এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর পলিটব্যুরো সদস্য কমরেড মানিক মুখার্জীকে আমন্ত্রণ জানান। ঐ অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে কমরেড মানিক মুখার্জী একটি বিশেষ সভায় সভাপতিত্ব করেন ও বক্তব্য রাখেন। উল্লেখ্য, এই সফরে আলোচনার মাধ্যমে উত্তর কোরিয়ার ওয়ার্কার্স পার্টি এবং এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর মধ্যে পার্টিগত সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছে। ছবিতে সামনের সারিতে বাঁদিক থেকে দ্বিতীয় কমরেড মানিক মুখার্জী।

উচ্ছেদ বন্ধ করার দাবি

এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর কলকাতা জেলা সম্পাদক কমরেড চিররঞ্জন চক্রবর্তী ৯ এপ্রিল এক বিবৃতিতে বলেন—

'আমরা লক্ষ করছি যে, পূর্বতন সিপিএম সরকারের মতো বর্তমান সরকারও গরিব বস্তিবাসী, হকার প্রমুখদের উচ্ছেদ করছে। কলকাতার বেশ কিছু জায়গায় হকার উচ্ছেদ করা হয়েছে, নোনাডাঙায় গরিব বস্তিবাসীদের পুলিশ লাঠি চার্জ করে উচ্ছেদ করেছে। শুধু তাই নয়, সরকারের এই ভূমিকার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ যারা করছে সরকার তাদের কণ্ঠরোধ করছে, মিথ্যা অভিযোগে গ্রেপ্তার করছে, জেলে পুরছে। আমরা রাজ্য সরকারের এই ভূমিকার তীব্র প্রতিবাদ করছি এবং অবিলম্বে গরিব বস্তিবাসী ও হকারদের উচ্ছেদ অভিযান বন্ধ করার দাবি জানাচ্ছি।'

বিদ্যুতের বিপুল মাশুল বৃদ্ধির বিরুদ্ধে পাটনা বনধ সর্বাত্মক

বিহারে মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমার নেতৃত্বাধীন জে ডি ইউ-বিজেপি জোট সরকার বিদ্যুতের মাশুল ৫০ শতাংশ বাড়ানোর কথা ঘোষণা করেছে। এরই প্রতিবাদে এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট) সহ ২২ টি বাম-গণতান্ত্রিক ও সামাজিক সংগঠনের উদ্যোগে গড়ে ওঠা 'মাহাঙ্গী বিজলী বিরোধী সংঘর্ষ মঞ্চ' ১২ এপ্রিল পাটনা বনধের ডাক দেয়। জনসাধারণের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণে সর্বাত্মক সফল হয় এই বনধ। আন্দোলন ও বনধের চাপে মাশুল বৃদ্ধি ১২.১ শতাংশের বেশি করতে পারেনি সরকার। অবশ্যই এটা আন্দোলনের আংশিক সফলতা।

এই বনধের পক্ষে সংঘর্ষ মঞ্চ কয়েকদিন ধরে ব্যাপক প্রচারে নামে। ১১ এপ্রিল শহিদ ভগৎ সিং-চক থেকে এক মিছিল বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে পাটনা জংশনে পৌঁছোয় এবং সেখানে মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমারের কুশপুতুল পোড়ানো হয়। সমবেত জনতার সামনে এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট) বিহার রাজ্য কমিটির সদস্য কমরেড অরুণ সিং বলেন, বিদ্যুৎকে বেসরকারি হাতে তুলে দেওয়ার জন্য সরকার বিহার রাজ্য বিদ্যুৎ বোর্ডকে নানা ভাগে বিভক্ত করছে। 'সুশাসন' ও 'উন্নয়নের' নাম করে চূড়ান্ত জনবিরোধী বিদ্যুৎ আইন ২০০৩ কার্যকর করছে, যার ফলে বিদ্যুতের দাম বেড়েই চলেছে।

উন্নয়নের ধোঁকাবাজিতে বিভ্রান্ত না হয়ে এই বনধ সফল করার জন্য এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট) বিহার রাজ্য কমিটির সম্পাদক কমরেড শিবশঙ্কর জনগণকে অভিনন্দন জানিয়ে বলেন, নীতীশ সরকার কংগ্রেস ও পূর্বতন রাজ্য সরকারগুলির জনবিরোধী নীতিই কার্যকর করছে। তিনি বলেন, আন্দোলনের মধ্য দিয়েই এসব প্রতিরোধ করতে হবে। তার জন্য তিনি এলাকায় এলাকায় গণকমিটি গড়ে তোলার বিশেষ প্রয়োজনীয়তার কথা বলেন।

মহিলাদের ওপর আক্রমণের প্রতিবাদে এ আই এম এস এস-এর বিক্ষোভ

১৪ এপ্রিল রাতে কলকাতার কালিকাপুর বাইপাসে এক মহিলার উপর আক্রমণকারী দুষ্কৃতীকে টহলরত এক পুলিশ অফিসার ধরে থানায় নিয়ে গেলেও তাকে ছেড়ে দেওয়া হয়। এই ঘটনার তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে এ আই এম এস এস-এর কলকাতা জেলা কমিটি ১৬ এপ্রিল গড়ফা থানায় বিক্ষোভ দেখায়। দাবি জানানো হয় — অবিলম্বে ঐ দুষ্কৃতীকে কঠোর শাস্তি দিতে হবে, আক্রান্ত মহিলার নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে হবে এবং কর্তব্যে অবহেলার জন্য ঐ রাতে থানায় কর্তব্যরত পুলিশ অফিসারকে শাস্তি দিতে হবে। আই সি জানান, ঐ পুলিশ অফিসারকে সাসপেন্ড ও দুষ্কৃতীকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

দক্ষিণ ২৪ পরগণার মল্লিকপুরে এক অবসরপ্রাপ্ত বিজ্ঞানী ও তাঁর কন্যার উপর স্থানীয় একটি ক্লাবের দুর্বৃত্তদের হামলার প্রতিবাদে ১৮ এপ্রিল বারুইপুর থানায় ডেপুটেশন দেয় এম এস এসের কলকাতা জেলা সম্পাদিকা কমরেড প্রণতি করের নেতৃত্বে তিনজনের এক প্রতিনিধি দল। ঘটনার নিরপেক্ষ তদন্তের দাবি করা হয়।

মানিক মুখার্জী কর্তৃক এস ইউ সি আই (সি) পঃ বঃ রাজ্য কমিটির পক্ষে ৪৮ লেনিন সরণী, কলকাতা-১৩ হইতে প্রকাশিত ও গণদাবী প্রিন্টার্স অ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ৫২বি ইন্ডিয়ান মিরর স্ট্রিট, কলকাতা-১৩ হইতে মুদ্রিত।
সম্পাদক মানিক মুখার্জী। ফোন ঃ সম্পাদকীয় দপ্তর ঃ ২২২৭১৯৫৪, ২২২৬০২৫১ ম্যানেজারের দপ্তর ঃ ২২৬৫৩২৩৪ ফ্যাক্স ঃ (০৩৩) ২২৬৪-৫১১৪, e-mail : ganadabi@gmail.com Website : www.suci-c.in